সত্যজিৎ রায়

বারো একের গল্প

বারো ভূতের গপ্পো

সত্যজিৎ রায়

ছোটদের বইয়ের স্বপ্নরাজ্য

শৈব্যা প্রকাশন বিভাগ

৮৬/১ মহাত্মা গান্ধী রোড ■ কলকাতা-৯

প্রকাশক ঃ
সোমনাথ বল
৮৬/১ মহাত্মা গান্ধী রোড
কলকাতা-৭০০ ০০৯

প্রথম প্রকাশ ঃ বইমেলা ২০০৪

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা ঃ সন্দীপ রায়

গ্রন্থস্বত্ব ঃ সন্দীপ রায়

মূল্য ঃ পঞ্চাশ টাকা

ISBN NO. : 81-87051-04-3

অক্ষর বিন্যাস ঃ
নিরঞ্জন লেজার পয়েন্ট
১০৬বি, রাজা রামমোহন রায় সরণি
কলকাতা-৭০০ ০০৯

মুদ্রণ ঃ
দ্বিজেন্দ্র অফসেট
২০/৩ পুলিন অ্যাভেনিউ
কলকাতা-৭০০ ০৮১

নিবেদন

ভূত থাকুক বা নাই থাকুক, ভূতের গল্প ছিল, আছে, থাকবে। অন্ধকার ঘরে একা থাকতে হলে ভূতের ভয় লাগতেই পারে। নির্জন সিড়ি ভেঙ্গে ছাদে যাবার সময় মনে হতেই পারে ঘাড়ের কাছে অদৃশ্য কেউ যেন বরফ-শীতল নিঃশ্বাস ফেলছে। ফাঁকা মাঠের মধ্যে দিয়ে রাতের বেলা আসতে গিয়ে মনে হতেই পারে দূরের অন্ধকারে খানিকটা জায়গা যেন একটু বেশি জমাট বেধে রয়েছে। এতসব ভয়ভীতি থাকলেও ভূতের গল্প পড়ার নেশা কি কমবে? কখ্খনো না। আমার নিজেরও ছেলেবেলায় বেজায় ভূতের ভয় ছিল। বাবা ব্যাপারটা জানতে পেরে রাতের বেলা নির্জন আলো-আধারে ঘেরা বাগানের মধ্যে দিয়ে ফিট-তিরিশেক দূরের গেটটা ঠিকভাবে বন্ধ করা আছে-কিনা দেখে আসতে বলেছিলেন। দুরু-দুরু বক্ষে আধবোঁজা চোখে গেট অবধি পৌঁছে নিরাপদে ফিরে আসার পরেই ভূতের ভয় কেটে গেয়েছিল (শেষ কথাটা অবশ্য বুক-ফুলিয়ে বলছিনা), কিন্তু ভূতের গল্প পড়ার নেশা তখনো ছিল, এখনো আছে।

সেই মান্ধাতার আমল থেকেই ভূতের গল্প জনপ্রিয়। কিন্তু সত্যজিৎ রায় বাংলা ভূতের গল্পে একটা নতুন ধারার সৃষ্টি করেছেন। আরো আগে লীলা মজুমদার অবশ্য ভূতেদের একদম অন্য চেহারায় হাজির করেছিলেন। ওঁদের আগে (উপেন্দ্রকিশোরকে হিসেবে ধরছি না) ভূত মানেই ছিল ভয়ংকর, ভূত মানেই বিভৎস ইত্যাদি। কিন্তু সত্যজিৎ ভূতেদের অন্য চেহারা দিলেন। গা ছমছমানি, শরীর শিরশিরানি পুরো মাত্রায় বহাল, কিন্তু বিভৎস রস বেমালুম উধাও। 'অনাথবাবুর ভয়' সত্যজিৎ রায়ের লেখা প্রথম ভূতের গল্প। আর

'অভিরাম' তাঁর জীবনের শেষ ভূতের গল্প। এই দুটি গল্প এবং আরোও দশটি জমজমাট ভূতের গল্প নিয়েই আমাদের এই সংকলন—"বারো ভূতের গপ্পো।"

বিভিন্ন চেহারায় ভূতেরা এসেছে এই সংকলনের বিভিন্ন গল্পে। মানুষ, জন্তু জানোয়ারের ভূত-তো আছেই, বেশ কিছু জড় পদার্থও অশরীরীরূপে হাজির হয়েছে এখানে।

প্রচুর ভূতের গল্প লিখেছেন সত্যজিৎ রায়। তাঁর লেখা অসাধারণ ভৌতিক সাহিত্যের সামান্য ইশারা দেবার জন্য বর্তমান এই সংকলন। সবকটি গল্পই প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল সন্দেশের পাতায়। সন্দেশে প্রকাশের সময় লেখক গল্পগুলির (গগন চৌধুরীর স্টুডিও এবং অভিরাম বাদে) অলংকরণের সঙ্গে হেডপিসও এঁকেছিলেন। গ্রন্থাকারে প্রকাশের সময় সেই হেডপিসগুলি সংযোজিত হয়নি। বর্তমান সংকলনের অন্যতম আকর্ষণ ঐ হেডপিসগুলি।

শ্রী সন্দীপ রায়ের সহযোগিতা বিনা এই সংকলনের কাজে হাত দেওয়া যেতো না। তাঁর এবং শ্রীমতী বিজয়া রায়ের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ। সৌজন্য-স্বীকৃতি জ্ঞাপন করছি আনন্দ পাবলিশার্স-এর প্রতি।

দেবাশিস সেন

বারো ভূতের গপ্পো ❑ সূচিপত্র

অনাথবাবুর ভয়	—	৬
নীল আতঙ্ক	—	১৮
ফ্রিৎস	—	৩২
ব্রাউন সাহেবের বাড়ি	—	৪৪
রতনবাবু আর সেই লোকটা	—	৫৮
মিঃ শাসমলের শেষ রাত্রি	—	৭৬
ভূতো	—	৮৬
গগন চৌধুরীর স্টুডিও	—	১০০
আমি ভূত	—	১১২
কাগ্‌তাড়ুয়া	—	১২০
অভিরাম	—	১২৬
তারিণীখুড়ো ও লখ্‌নৌর ডুয়েল	—	১৩২

অনাদিবাবুর ভূত

অনাথবাবুর সঙ্গে আমার আলাপ ট্রেনের কামরায়। আমি যাচ্ছিলাম রঘুনাথপুর, হাওয়াবদলের জন্য। কলকাতায় খবরের কাগজের আপিসে চাকরি করি। গত ক'মাস ধরে কাজের চাপে দমবন্ধ হবার উপক্রম হয়েছিল। তা ছাড়া আমার লেখার শখ, দু-একটা গল্পের প্লটও মাথায় ঘুরছিল, কিন্তু এত কাজের মধ্যে কি আর লেখার ফুরসত জোটে? তাই আর সাত-পাঁচ না ভেবে দশদিনের পাওয়া ছুটি আর দিস্তেখানেক কাগজ নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম।

এত জায়গা থাকতে রঘুনাথপুর কেন তারও অবিশ্যি একটা কারণ আছে। ওখানে বিনা-খরচায় থাকার একটা ব্যবস্থা জুটে গেছে। আমার কলেজের সহপাঠী বীরেন বিশ্বাসের পৈতৃক বাড়ি রয়েছে রঘুনাথপুরে। কফি হাউসে বসে, ছুটিতে কোথায় যাওয়া যায়, এই আলোচনা প্রসঙ্গে বীরেন খুব খুশি হয়ে ওর বাড়িটা অফার করে বলল, 'আমিও যেতুম, কিন্তু আমার এদিকে ঝামেলা, বুঝতেই তো পারছিস। তবে তোর কোনওই অসুবিধা হবে না। আমাদের পঞ্চাশ বছরের পুরনো চাকর ভরদ্বাজ রয়েছে ও বাড়িতে। ও-ই তোর দেখাশুনো করবে। তুই চলে যা।'

গাড়িতে যাত্রী ছিল অনেক। আমার বেঞ্চিতে আমারই পাশে বসে ছিলেন অনাথ বন্ধু মিত্র। বেঁটেখাটো মানুষটি, বছর পঞ্চাশেক আন্দাজ বয়স। মাঝখানে টেরিকাটা কাঁচাপাকা চুল, চোখের চাহনি তীক্ষ্ণ, আর ঠোঁটের কোণে এমন একটা ভাব যেন মনের আনাচে-কানাচে সদাই কোনও মজার চিন্তা ঘোরাফেরা করছে। পোশাক-আশাকের ব্যাপারেও একটা বিশেষত্ব লক্ষ করলাম; ভদ্রলোককে হঠাৎ দেখলে মনে হবে তিনি যেন পঞ্চাশ বছরের পুরনো কোনও নাটকের চরিত্রে অভিনয় করার জন্য সেজেগুজে তৈরি হয়ে এসেছেন। ওরকম কোট, ও ধরনের শার্টের কলার, ওই চশমা, আর বিশেষ করে ওই বুট জুতো—এসব আর আজকালকার দিনে কেউ পরে না।

অনাথবাবুর সঙ্গে আলাপ করে জানলাম তিনিও রঘুনাথপুর যাচ্ছেন। কারণ জিজ্ঞেস করাতে কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে পড়লেন। কিংবা এও হতে পারে যে, ট্রেনের শব্দের জন্য তিনি আমার প্রশ্ন শুনতে পাননি।

বীরেনের পৈতৃক ভিটেটি দেখে মনটা খুশি হয়ে উঠল। বেশ বাড়ি। সামনে একফালি জমি—তাতে সবজি ও ফুলগাছ দুই-ই হয়েছে। কাছাকাছির মধ্যে অন্য কোনও বাড়িও নেই, কাজেই পড়শির উৎপাত থেকেও রক্ষা।

আমি আমার থাকার জন্য ভরদ্বাজের আপত্তি সত্ত্বেও চিলেকোঠাটি বেছে নিলাম। আলো, বাতাস এবং নির্জনতা, তিনটেই অপর্যাপ্ত পাওয়া যাবে ওখানে। ঘর দখল করে জিনিসপত্র গোছাবার সময় দেখি আমার দাড়ি কামানোর খুর আনতে ভুলে গিয়েছি। ভরদ্বাজ শুনে বলল, 'তাতে আর কী হয়েছে খোকাবাবু। এই তো কুণ্ডুবাবুর দোকান, পাঁচ মিনিটের পথ। সেখানে গেলেই পাবে'খন বিলেড।'

বিকেল চারটে নাগাদ চা-টা খেয়ে কুণ্ডুবাবুর দোকানের উদ্দেশে বেরিয়ে পড়লাম। গিয়ে দেখি সেটি একটি ভাল আড্ডার জায়গা। দোকানের ভিতর দুটি বেঞ্চিতে বসে পাঁচ-সাতটি প্রৌঢ় ভদ্রলোক রীতিমতো গল্প জমিয়েছেন। তাঁদের মধ্যে একজন বেশ উত্তেজিত ভাবে বলছেন, 'আরে বাপু, এ তো আর শোনা কথা নয়! এ আমার নিজের চোখে দেখা। আর তিরিশ বছর হয়ে গেল বলেই কি সব মন থেকে মুছে গেল? এসব স্মৃতি অত সহজে ভোলবার নয়, আর বিশেষ করে যখন হলধর দত্ত ছিল আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু। তার মৃত্যুর জন্য আমি যে কিছু অংশে দায়ী, সে বিশ্বাস আমার আজও যায়নি।'

আমি এক প্যাকেট সেভন-ও-ক্লক কিনে আরও দু-একটা অবান্তর জিনিসের খোঁজ করতে লাগলাম। ভদ্রলোক বলে চললেন, 'ভেবে দেখুন, আমারই বন্ধু আমারই সঙ্গো মাত্র দশ টাকা বাজি ধরে রাত কাটাতে গেল ওই উত্তর-পশ্চিমের ঘরটাতে। পরদিন ফেরে না, ফেরে না, ফেরে না—শেষটায় আমি, জিতেন বক্সি, হরিচরণ সা, আর আরও তিন-চারজন কে ছিল ঠিক মনে নেই—গেলুম হালদার-বাড়িতে হলধরের খোঁজ করতে। গিয়ে দেখি বাবু ওই ঘরের মেঝেতে হাত-পা ছড়িয়ে মরে কাঠ হয়ে আছে, তাঁর চোখ চাওয়া, দৃষ্টি কড়িকাঠের দিকে। আর সেই দৃষ্টিতে ভয়ের যে নমুনা দেখলুম, তাতে ভূত ছাড়া আর কী ভাবব বলুন? গায়ে কোনও ক্ষতচিহ্ন নেই, বাঘের আঁচড় নেই, সাপের ছোবল নেই, কিচ্ছু নেই। আপনারাই বলুন এখন কী বলবেন।'

আরও মিনিট পাঁচেক দোকানে থেকে আলোচনার বিষয়টি সম্পর্কে মোটামুটি একটা ধারণা হল। ব্যাপারটা এই—রঘুনাথপুরের দক্ষিণপ্রান্তে হালদারবাড়ি বলে একটি দুশো বছরের পুরনো ভগ্নপ্রায় জমিদারি প্রাসাদ আছে। সেই প্রাসাদে—বিশেষ করে তার দোতলার উত্তর-পশ্চিম কোণের একটি ঘরে—না কি অনেককালের পুরনো একটি ভূতের আনাগোনা আছে। অবশ্য সেই ত্রিশ বছর আগে ভবতোষ মজুমদারের বন্ধু হলধর দত্তের মৃত্যুর পর আজ অবধি নাকি কেউ সে বাড়িতে রাত কাটায়নি। কিন্তু তাও রঘুনাথপুরের বাসিন্দারা ভূতের অস্তিত্ব মনেপ্রাণে বিশ্বাস করে

বেশ একটা রোমাঞ্চ অনুভব করে। আর বিশ্বাস করার কারণও আছে যথেষ্ট। একে তো হলধর দত্তের রহস্যজনক মৃত্যু, তার উপর এমনিতেই হালদারবংশের ইতিহাসে নাকি খুনখারাপি, আত্মহত্যা ইত্যাদির অনেক নজির পাওয়া যায়।

মনে মনে হালদারবাড়ি সম্পর্কে বেশ খানিকটা কৌতূহল নিয়ে দোকানের বাইরে এসেই দেখি আমার ট্রেনের আলাপি অনাথবন্ধু মিত্র মশাই হাসি-হাসি মুখ করে দাঁড়িয়ে আছেন। আমায় দেখে বললেন, 'শুনছিলেন ওদের কথাবার্তা?'

বললাম, তা কিছুটা শুনেছি।'

'বিশ্বাস হয়?'

'কি? ভূত?'

'হ্যাঁ?'

'ব্যাপার কী জানেন—ভূতের বাড়ির কথা তো অনেকই শুনলাম, কিন্তু সেসব বাড়িতে থেকে নিজের চোখে ভূত দেখেছে এমন লোক তো কই আজ অবধি একটিও মিট করলাম না। তাই ঠিক—'

অনাথবাবু একটু হেসে বললেন, 'একবার দেখে আসবেন নাকি?'

'কী?'

'বাড়িটা।'

'দেখে আসব মানে—'

'বাইরে থেকে আর কি। বেশিদূর তো নয়। বড়জোর মাইলখানেক। এই রাস্তা দিয়ে সোজা গিয়ে জোড়াশিবের মন্দির ছাড়িয়ে ডানহাতি রাস্তায় ঘুরে পোয়াটাক পথ।'

ভদ্রলোককে বেশ ইন্টারেস্টিং লাগছিল। আর তা ছাড়া এত তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে গিয়ে কী করব? তাই চললাম তাঁর সঙ্গে।

হালদারদের বাড়িটা দূর থেকে দেখা যায় না, কারণ বাড়ির চারপাশে বড় বড় গাছের জঙ্গল। তবে বাড়ির গেটের মাথাটা দেখা যেতে থাকে পৌঁছনোর প্রায় দশ মিনিট আগে থেকেই। বিরাট ফটক, মাথার উপর ভগ্নপ্রায় নহবতখানা। ফটকের ভিতর দিয়ে বেশ খানিকদূর রাস্তা গিয়ে তবে সদর দালান। দু-তিনটে মূর্তি আর ফোয়ারার ভগ্নাবশেষ দেখে বুঝলাম যে বাড়ির আর ফটকের মাঝখানের এই জায়গাটা আগে বাগান ছিল। বাড়িটি অদ্ভুত। কারুকার্যের কোনও বাহার নেই তার কোনও জায়গায়। কেমন যেন একটা বেঢপ চৌকো-চৌকো ভাব। বিকেলের পড়ন্ত রোদ এসে পড়েছে তার শেওলাবৃত দেয়ালে।

মিনিটখানেক চেয়ে থাকার পর অনাথবাবু বললেন, 'আমি যতদূর জানি, রোদ

থাকতে ভূত বেরোয় না।' তারপর আমার দিকে চেয়ে চোখ টিপে বললেন, 'একবার চট করে সেই ঘরটা দেখে এলে হত না?'

'সেই উত্তর-পশ্চিমের ঘর? যে ঘরে—'

'হ্যাঁ। যে ঘরে হলধর দত্তের মৃত্যু হয়েছিল।'

ভদ্রলোকের তো এসব ব্যাপারে দেখছি একটু বাড়াবাড়ি রকমের আগ্রহ!

অনাথবাবু বোধহয় আমার মনের ভাবটা আঁচ করতে পেরেই বললেন, 'খুব আশ্চর্য লাগছে, না? আসলে কী জানেন? আপনাকে বলতে দ্বিধা নেই—আমার রঘুনাথপুর আসার একমাত্র কারণই হল ওই বাড়িটা।'

'বটে?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। ওটা যে ভূতের বাড়ি, আমি কলকাতায় থাকতে সে খবরটা পেয়ে ওই ভূতটিকে দেখব বলে এখানে এসেছি। আপনি সেদিন ট্রেনে আমার আসার কারণটা জানতে চাইলেন। আমি উত্তর না দিয়ে অভদ্রতা করলাম বটে, কিন্তু মনে মনে স্থির করেছিলাম যে, উপযুক্ত সময় এলে—অর্থাৎ আপনি কীরকম লোক সেটা আরেকটু জেনে নিয়ে, আসল কারণটা নিজে থেকেই বলব।'

'কিন্তু তাই বলে ভূতের পিছনে ধাওয়া করে একেবারে কলকাতা ছেড়ে—'

'বলছি, বলছি। ব্যস্ত হবেন না। আমার কাজটা সম্বন্ধেই তো বলা হয়নি এখনও আপনাকে। আসলে আমি ভূত সম্পর্কে একজন বিশেষজ্ঞ। আজ পঁচিশ বছর ধরে এ ব্যাপার নিয়ে বিস্তর রিসার্চ করেছি। শুধু ভূত কেন—ভূত, প্রেত, পিশাচ, ডাকিনী, যোগিনী, ভ্যাম্পায়ার, ওয়্যারউল্‌ফ, ভুডুইজম ইত্যাদি যা কিছু আছে তার সম্বন্ধে বইয়ে যা লেখে তার প্রায় সবই পড়ে ফেলেছি। সাতটা ভাষা শিখতে হয়েছে এসব বই পড়ার জন্য। পরলোকতত্ত্ব নিয়ে লন্ডনের প্রফেসার নর্টনের সঙ্গে আজ তিন বছর ধরে চিঠি লেখালেখি করছি। আমার লেখা প্রবন্ধ বিলেতের সব নামকরা কাগজে বেরিয়েছে। আপনার কাছে বড়াই করে কী লাভ, তবে এটুকু বলতে পারি যে, এদেশে এ ব্যাপারে আমার চেয়ে বেশি জ্ঞানী লোক বোধহয় আর নেই।'

ভদ্রলোকের কথা শুনে তিনি যে মিথ্যে বলছেন বা বাড়িয়ে বলছেন এটা আমার একবারও মনে হয় না। বরং তাঁর সম্বন্ধে খুব সহজেই একটা বিশ্বাস ও শ্রদ্ধার ভাব জেগে উঠল।

অনাথবাবু একটুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, 'ভারতবর্ষের অন্তত তিনশো ভূতের বাড়িতে আমি রাত কাটিয়েছি।'

'বলেন কী!'

'হ্যাঁ। আর সেসব কীরকম জায়গায় জানেন? এই ধরুন—জব্বলপুর, কার্সিয়াং, চেরাপুঞ্জি, কাঁথি, কাটোয়া, যোধপুর, আজিমগঞ্জ, হাজারিবাগ, সিউড়ি, বারাসাত, আর কত চাই? ছাপ্পান্নোটা ডাকবাংলো আর কম করে ত্রিশটা নীলকুঠিতে আমি

রাত্রিযাপন করেছি। এ ছাড়া কলকাতা এবং তার কাছাকাছির মধ্যে অন্তত পঞ্চাশখানা বাড়ি তো আছেই। কিন্তু—'

অনাথবাবু হঠাৎ থেমে গেলেন। তারপর ধীরে ধীরে মাথা নেড়ে বললেন, 'ভূত আমায় ফাঁকি দিয়েছে। হয়তো, ভূতকে যারা চায় না, ভূত তাদের কাছেই আসে। আমি বারবার হতাশ হয়েছি। মাদ্রাজে ত্রিচিনপল্লীতে দেড়শো বছরের পুরনো একটা সাহেবদের পরিত্যক্ত ক্লাব-বাড়িতে ভূত একবার কাছাকাছি এসেছিল। কীরকম জানেন? অন্ধকার ঘর, একফোঁটা বাতাস নেই, যতবারই মোমবাতি ধরাব বলে দেশলাই জ্বালাচ্ছি, ততবারই কে যেন ফুঁ দিয়ে নিভিয়ে দিচ্ছে। শেষটায় তেরোটা কাঠি নষ্ট করার পর বাতি জ্বলল, এবং আলোর সঙ্গে সঙ্গেই ভূতবাবাজি সেই যে গেলেন আর এলেন না। একবার কলকাতার ঝামাপুকুরের এক হানাবাড়িতেও একটা ইন্টারেস্টিং অভিজ্ঞতা হয়েছিল। আমার মাথায় তো এত চুল দেখছেন? অথচ, এই বাড়ির একটা অন্ধকার ঘরে ভূতের অপেক্ষায় বসে থাকতে থাকতে মাঝরাত্তির নাগাদ হঠাৎ ব্রহ্মতালুর কাছটায় একটা মশার কামড় খেলাম। কী ব্যাপার? অন্ধকারে ভয়ে ভয়ে মাথায় হাত দিয়ে দেখি একটি চুলও নেই! একেবারে মসৃণ মাথাজোড়া টাক! এ কি আমারই মাথা, না অন্য কারুর মাথায় হাত দিয়ে নিজের মাথা বলে মনে করেছি? কিন্তু মশার কামড়টা তো আমিই খেলাম। টর্চটা জ্বেলে আয়নায় দেখি টাকের কোনও চিহ্নমাত্র নেই। আমার যে-চুল সে-চুলই রয়েছে আমার মাথায়। ব্যস, এই দুটি ছাড়া আর কোনও ভুতুড়ে অভিজ্ঞতা এত চেষ্টা সত্ত্বেও আমার হয়নি। তাই ভূত দেখার আশা একরকম ছেড়েই দিয়েছিলুম, এমন সময় একটা পুরনো বাঁধানো 'প্রবাসী'তে রঘুনাথপুরের এই বাড়িটার একটা উল্লেখ পেলাম। তাই ঠিক করলাম একটা শেষ চেষ্টা দিয়ে আসব।'

অনাথবাবুর কথা শুনতে শুনতে কখন যে বাড়ির সদর দরজায় এসে পড়েছি সে খেয়াল ছিল না। ভদ্রলোক তাঁর ট্যাকঘড়িটা দেখে বললেন, 'আজ পাঁচটা একত্রিশে সূর্যাস্ত। এখন সোয়া পাঁচটা। চলুন, রোদ থাকতে থাকতে একবার ঘরটা দেখে আসি।'

ভূতের নেশাটা বোধহয় সংক্রামক, কারণ আমি অনাথবাবুর প্রস্তাবে কোনও আপত্তি করলাম না। বরঞ্চ বাড়ির ভিতরটা, আর বিশেষ করে দোতলার ওই ঘরটা দেখবার জন্য বেশ একটা আগ্রহ হচ্ছিল।

সদর দরজা দিয়ে ঢুকে দেখি বিরাট উঠোন ও নাটমন্দির। একশো-দেড়শো বছরে কত উৎসব, কত অনুষ্ঠান, কত পূজা-পার্বণ, কথকতা এইখানে হয়েছে, তার কোনও চিহ্ন আজ নেই।

উঠোনের তিনদিকে বারান্দা। আমাদের ডাইনে বারান্দার যে অংশ, তাতে একটি ভাঙা পালকি পড়ে আছে, এবং পালকিটি ছাড়িয়ে হাত দশেক গিয়েই দোতলায় যাবার সিঁড়ি।

সিঁড়িটা এমনই অন্ধকার যে, উঠবার সময় অনাথবাবুকে তাঁর কোটের পকেট থেকে একটি টর্চ বার করে জ্বালাতে হল। প্রায়-অদৃশ্য মাকড়সার জালের ব্যূহ ভেদ করে কোনওরকমে দোতলায় পৌঁছানো গেল। মনে মনে বললাম, এ বাড়িতে ভূত থাকা অস্বাভাবিক নয়!

দোতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে হিসাব করে দেখলাম বাঁ দিক দিয়ে সোজা চলে গেলে ওই যে ঘর, ওটাই হল উত্তর-পশ্চিমের ঘর। অনাথবাবু বললেন, 'সময় নষ্ট করে লাভ নেই। চলুন এগোই।'

এখানে বলে রাখি, বারান্দায় কেবল একটি জিনিস ছিল—সেটি একটি ঘড়ি। যাকে বলে গ্র্যান্ডফাদার ক্লক। কিন্তু তার অবস্থা খুবই শোচনীয়—কাচ নেই, বড় কাঁটাটিও উধাও, পেন্ডুলামটি ভেঙে কাত হয়ে পড়ে আছে।

উত্তর-পশ্চিমের ঘরের দরজাটি ভেজানো ছিল। অনাথবাবু যখন তাঁর ডান হাতের তর্জনী দিয়ে সন্তর্পণে ঠেলে দরজাটি খুলছিলেন, তখন বিনা কারণেই আমার গা-টা ছমছম করছিল।

কিন্তু ঘরের ভিতর ঢুকে অস্বাভাবিক কিছু লক্ষ করলাম না। দেখে মনে হয় এককালে বৈঠকখানা ছিল। ঘরের মাঝখানে একটা বিরাট টেবিল, তার কেবল পায়া চারখানাই রয়েছে, উপরের তক্তাটা নেই। টেবিলের পাশে জানলার দিকে একটি আরাম কেদারা। অবিশ্যি এখন আর সেটি আরামদায়ক হবে কিনা সন্দেহ, কারণ তার একটি হাতল ও বসবার জায়গায় বেতের খানিকটা অংশ লোপ পেয়েছে।

উপরের দিকে চেয়ে দেখি ছাত থেকে ঝুলছে একটি টানাপাখার ভগ্নাংশ। অর্থাৎ তার দড়ি নেই, কাঠের ডান্ডাটা ভাঙা এবং ঝালরের অর্ধেকটা ছেঁড়া।

এ ছাড়া ঘরে আছে একটি খাঁজকাটা বন্দুক রাখার তাক, একটি নলবিহীন গড়গড়া, আর দু'খানা সাধারণ হাতলভাঙা চেয়ার।

অনাথবাবু কিছুক্ষণ একেবারে স্তব্ধ হয়ে রইলেন। মনে হল খুব মনোযোগ দিয়ে কী একটা অনুভব করার চেষ্টা করলেন। প্রায় মিনিটখানেক পরে বললেন, 'একটা গন্ধ পাচ্ছেন?'

'কী গন্ধ?'

'মাদ্রাজি ধূপ, মাছের তেল, আর মড়াপোড়ার গন্ধ মেশানো একটা গন্ধ?'

আমি বার দু-এক বেশ জোরে জোরে শ্বাস টানলাম। অনেকদিনের বন্ধ ঘর খুললে যে একটা ভ্যাপসা গন্ধ বেরোয়, সে গন্ধ ছাড়া আর কোনও গন্ধই পেলাম না। তাই বললাম, 'কই, ঠিক বুঝতে পারছি না তো।'

অনাথবাবু আরও একটুক্ষণ চুপ করে থেকে হঠাৎ বাঁ হাতের তেলোতে ডান হাত দিয়ে একটা ঘুঁষি মেরে বললেন, 'বহুত আচ্ছা! এ গন্ধ আমার চেনা গন্ধ। এ

বাড়িতে ভূত অবশ্যম্ভাবী। তবে বাবাজি দেখা দেবেন কি না দেবেন সেটা কাল রাত্রের আগে বোঝা যাবে না। চলুন।'

অনাথবাবু স্থির করে ফেললেন যে, পরদিনই তাঁকে এ ঘরে রাত্রিবাস করতে হবে। ফেরার পথে বললেন, 'আজ থাকলুম না কারণ কাল অমাবস্যা—ভূতের পক্ষে সবচেয়ে প্রশস্ত তিথি। তা ছাড়া দু-একটি জিনিস সঙ্গে রাখা দরকার। সেগুলো বাড়িতে রয়ে গেছে, কাল নিয়ে আসব। আজ সার্ভেটা করে গেলুম আর কি।'

ভদ্রলোক আমায় বাড়ি অবধি পৌঁছে দিয়ে বিদায় নেবার সময় গলাটা একটু নামিয়ে বললেন, 'আর কাউকে আমার এই প্ল্যানের কথা বলবেন না যেন। এদের কথাবার্তা তো শুনলুম আজকে—যা ভয় আর যা প্রেজুডিস এদের, জানলে পরে হয়তো বাধাটাধা দিয়ে আমার প্ল্যানটাই ভেস্তে দেবে। আর হ্যাঁ, আরেকটা কথা।

আপনাকে আমার সঙ্গে যেতে বললুম না বলে কিছু মনে করবেন না। এসব ব্যাপার, বুঝলেন কিনা, একা না হলে ঠিক জুতসই হয় না।'

পরদিন দুপুরে কাগজকলম নিয়ে বসলেও লেখা খুব বেশিদূর এগোলো না। মন পড়ে রয়েছে হালদারবাড়ির ওই উত্তর-পশ্চিমের ঘরটায়। আর রাত্রে অনাথবাবুর কী অভিজ্ঞতা হবে সেই নিয়ে একটা অশান্তি উদ্বেগ রয়েছে মনের মধ্যে।

বিকেলে অনাথবাবুকে হালদারবাড়ির ফটক অবধি পৌঁছে দিলাম। ভদ্রলোকের গায়ে আজ একটা কালো গলাবন্ধ কোট, কাঁধে জলের ফ্লাস্ক আর হাতে সেই কালকের তিন সেলের টর্চ। ফটক দিয়ে ঢুকবার আগে কোটের দু'পকেটে দু'হাত ঢুকিয়ে দুটো বোতল বার করে আমায় দেখিয়ে বললেন, 'এই দেখুন—এটিতে রয়েছে আমার নিজের ফরমুলায় তৈরি তেল—শরীরের অনাবৃত অংশে মেখে নিলে আর মশা কামড়াবে না। আর এই দ্বিতীয়টিতে হল কারবলিক অ্যাসিড, ঘরের আশেপাশে ছড়িয়ে দিলে সাপের উৎপাত থেকে নিশ্চিন্ত।' এই বলে বোতল দুটো পকেটে পুরে, টর্চটা মাথায় ঠেকিয়ে আমায় একটা সেলাম ঠুকে ভদ্রলোক বুটজুতো খটখটিয়ে হালদারবাড়ির দিকে চলে গেলেন।

রাত্রে ভাল ঘুম হল না।

ভোর হতে না হতে ভরদ্বাজকে বললাম আমার থার্মসফ্লাস্ক দু'জনের মতো চা ভরে দিতে। চা এলে পর ফ্লাস্কটি নিয়ে আবার হালদারবাড়ির উদ্দেশে রওনা দিলাম।

হালদারবাড়ির ফটকের কাছে পৌঁছে দেখি চারিদিকে কোনও সাড়াশব্দ নেই। অনাথবাবুর নাম ধরে ডাকব, না সটান দোতলায় যাব তাই ভাবছি, এমন সময় হঠাৎ শুনতে পেলাম—'ও মশাই, এই যে এদিকে।'

এবার দেখতে পেলাম অনাথবাবুকে—প্রাসাদের পুবদিকের জঙ্গলের ভিতর থেকে বেরিয়ে আমার দিকে হেঁটে আসছেন। তাঁকে দেখে মোটেই মনে হয় না যে, রাত্রে তাঁর কোনও ভয়াবহ বা অস্বাভাবিক অভিজ্ঞতা হয়েছে।

আমার কাছে এসে হাসতে হাসতে হাতে একটা নিমের ডাল দেখিয়ে বললেন, 'আর বলবেন না মশাই! আধঘণ্টা বনেবাদাড়ে ঘুরছি এই নিমডালের খোঁজে। আমার আবার দাঁতনের অভ্যেস কিনা।'

ফস করে রাত্রের কথাটা জিজ্ঞেস করতে কেমন বাধো-বাধো ঠেকল। বললাম, 'চা এনেছি। এখানেই খাবেন, না বাড়ি যাবেন?'

'চলুন না, ওই ফোয়ারার পাশটায় বসে খাওয়া যাক।'

গরম চায়ে চুমুক দিয়ে একটা তৃপ্তিসূচক 'আঃ' শব্দ করে আমার দিকে ফিরে মুচকি হেসে অনাথবাবু বললেন, 'খুব কৌতূহল হচ্ছে, না?'

আমি আমতা আমতা করে বললাম, 'হ্যাঁ, মানে, তা একটু—'

'বেশ। তবে বলছি শুনুন। গোড়াতেই বলে রাখি—এক্সপিডিশন হাইলি সাকসেসফুল। আমার এখানে আসা সার্থক হয়েছে।' অনাথবাবু এক মগ চা শেষ করে দ্বিতীয় মগ ঢেলে তাঁর কথা শুরু করলেন ঃ

'আপনি যখন আমায় পৌঁছে দিয়ে গেলেন তখন পাঁচটা। আমি বাড়ির ভেতরে ঢোকার আগে এই আশপাশটা একটু সার্ভে করে নিলুম। অনেক সময় ভূতের চেয়ে জ্যান্ত মানুষ বা জানোয়ার থেকে উপদ্রবের আশঙ্কা বেশি থাকে। যাই হোক, দেখলুম কাছাকাছির মধ্যে সন্দেহজনক কিছু নেই।

'বাড়িতে ঢুকে একতলার ঘরগুলোর মধ্যে যেগুলো খোলা হয়েছে সেগুলোও একবার দেখে নিলুম। জিনিসপত্তর তো আর অ্যাদ্দিন ধরে বিশেষ পড়ে থাকার কথা নয়। একটা ঘরে কিছু আবর্জনা, আর আরেকটার কড়িকাঠে গুটি চারেক ঝুলন্ত বাদুড় ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়ল না। বাদুড়গুলো আমায় দেখেও নড়ল না। আমিও তাদের ডিসটার্ব করলুম না।

'সাড়ে ছ'টা নাগাদ দোতলার ওই আসল ঘরটিতে ঢুকে রাত কাটানোর আয়োজন শুরু করলুম। একটা ঝাড়ন এনেছিলুম, তাই দিয়ে প্রথমে আরাম-কেদারাটিকে ঝেড়েপুঁছে সাফ করলুম। কদ্দিনের ধুলো জমেছিল তাতে কে জানে?

'ঘরের মধ্যে একটা গুমোট ভাব ছিল, তাই জানলাটা খুলে দিলুম। ভূতবাবাজি যদি সশরীরে আসতে চান তাই বারান্দার দরজাটাও খোলা রাখলুম। তারপর টর্চ ও ফ্লাস্কটা মেঝেতে রেখে ওই বেতছেঁড়া আরাম-কেদারাতেই শুয়ে পড়লুম। অসোয়াস্তি হচ্ছিল বেশ, কিন্তু এর চেয়েও আরও অনেক বেয়াড়া অবস্থায় বহুবার রাত কাটিয়েছি, তাই কিছু মাইন্ড করলুম না।

'আশ্বিন মাস, সাড়ে পাঁচটায় সূর্য ডুবেছে। দেখতে দেখতে অন্ধকারটা বেশ জমাট বেঁধে উঠল। আর সেইসঙ্গে সেই গন্ধটাও ক্রমশই স্পষ্ট হয়ে উঠল। আমি এমনিতে খুব ঠাণ্ডা মেজাজের মানুষ, সহজে বড় একটা একসাইটেড হই না, কিন্তু কাল যেন ভিতরে ভিতরে বেশ একটা উত্তেজনা অনুভব করছিলুম।

'সময়টা ঠিক বলতে পারি না, তবে আন্দাজে মনে হয় ন'টা কি সাড়ে ন'টা নাগাদ জানলা দিয়ে একটা জোনাকি ঘরে ঢুকেছিল। সেটা মিনিটখানেক ঘোরাঘুরি করে আবার জানলা দিয়েই বেরিয়ে গেল।

'তারপর কখন যে শেয়াল, ঝিঁঝির ডাক থেমে গেছে, আর কখন যে আমি ঘুমিয়ে পড়েছি সে খেয়াল নেই।

'ঘুমটা ভাঙল একটা শব্দে। ঘড়ির শব্দ। ঢং ঢং ঢং করে বারোটা বাজল। মিঠে অথচ বেশ জোর আওয়াজ। জাত ঘড়ির আওয়াজ, আর সেটা আসছে বাইরের বারান্দা থেকে।

'কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই ঘুমটা ছুটে গিয়ে সম্পূর্ণ সজাগ হয়ে আরও দুটো জিনিস লক্ষ করলুম। এক—আমি আরাম-কেদারায় সত্যিই খুব আরামে শুয়ে আছি। ছেঁড়াটা তো নেইই, বরং উলটে আমার পিঠের তলায় কে যেন একটা বালিশ গুঁজে দিয়ে গেছে। আর দুই—আমার মাথার উপর একটি চমৎকার ঝালর সমেত আস্ত নতুন টানাপাখা, তা থেকে একটি নতুন দড়ি দেয়ালের ফুটো দিয়ে বারান্দায় চলে গেছে, এবং কে জানি সে দড়িতে টান দিয়ে পাখাটি দুলিয়ে আমায় চমৎকার বাতাস করছে।

'আমি অবাক হয়ে এইসব দেখছি আর উপভোগ করছি, এমন সময় খেয়াল হল অমাবস্যার রাত্তিরে কী করে জানি ঘরটা চাঁদের আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। তারপর নাকে এল একটা চমৎকার গন্ধ। পাশ ফিরে দেখি কে জানি একটা আলবোলা রেখে গেছে, আর তার থেকে ভুরভুর করে বেরোচ্ছে একেবারে সেরা অম্বুরী তামাকের গন্ধ।'

অনাথবাবু একটু থামলেন। তারপর আমার দিকে ফিরে হেসে বললেন, 'বেশ মনোরম পরিবেশ নয় কি?'

আমি বললাম, 'শুনে তো ভালই লাগছে। আপনার রাতটা তা হলে মোটামুটি আরামেই কেটেছে?'

আমার প্রশ্ন শুনে অনাথবাবু হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেলেন। খানিকক্ষণ অপেক্ষা করে আমি আর ধৈর্য রাখতে না পেরে বললাম, 'তা হলে কি সত্যি আপনার কোনও ভয়ের কারণ ঘটেনি? ভূত কি আপনি দেখেননি?'

অনাথবাবু আবার আমার দিকে চাইলেন। এবার কিন্তু আর ঠোঁটের কোণে সে হাসিটা নেই। ধরা গলায় ভদ্রলোকের প্রশ্ন এল, 'পরশু যখন আপনি ঘরটায় গেলেন, তখন কড়িকাঠের দিকটা ভাল করে লক্ষ করেছিলেন কি?'

আমি বললাম, 'তেমন ভাল করে দেখিনি বোধহয়। কেন বলুন তো?'

অনাথবাবু বললেন, 'ওখানে একটা বিশেষ ব্যাপার রয়েছে, সেটা না দেখলে বাকি ঘটনাটা বোঝাতে পারব না। চলুন।'

অন্ধকার সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে অনাথবাবু কেবল একটি কথা বললেন ঃ 'আমার আর ভূতের পিছনে ধাওয়া করতে হবে না সীতেশবাবু। কোনওদিনও না। সে শখ মিটে গেছে।'

বারান্দা দিয়ে যাবার পথে ঘড়িটার দিকে চেয়ে দেখলাম সেরকমই ভাঙা অবস্থা।

ঘরের দরজার সামনে পৌঁছে অনাথবাবু বললেন, 'চলুন।'

দরজাটা ভেজানো ছিল। আমি হাত দিয়ে ঠেলে ঘরের মধ্যে ঢুকলাম। তারপর দু'পা এগিয়ে মেঝের দিকে চোখ পড়তেই আমার সমস্ত শরীরে একটা বিস্ময় ও আতঙ্কের শিহরণ খেলে গেল।

বুট জুতো পরা ও কে পড়ে আছে মেঝেতে?

আর বারান্দার দিক থেকে কার অট্টহাসি হালদারবাড়ির আনাচে-কানাচে প্রতিধ্বনিত হয়ে আমার রক্ত জল করে আমার জ্ঞান-বুদ্ধি-চিন্তা সব লোপ পাইয়ে দিচ্ছে? তা হলে কি—?

আর কিছু মনে নেই আমার।

যখন জ্ঞান হল, দেখি ভরদ্বাজ আমার খাটের পায়ের দিকে দাঁড়িয়ে আছে, আর আমায় হাতপাখা দিয়ে বাতাস করছেন ভবতোষ মজুমদার। আমার চোখ খুলতে দেখে ভবতোষবাবু বললেন, 'ভাগ্যে সিধুচরণ আপনাকে দেখেছিল ও বাড়িতে ঢুকতে, নইলে যে কী দশা হত আপনার জানি না। ওখানে গেসলেন কোন আক্কেলে?'

আমি বললাম, 'অনাথবাবু যে রাত্রে—'

ভবতোষবাবু বাধা দিয়ে বললেন, 'আর অনাথবাবু! কাল যে অতগুলো কথা বললুম সে সব বোধহয় কিছুই বিশ্বাস করেননি ভদ্রলোক। ভাগ্যে আপনিও তাঁর সঙ্গে সঙ্গে রাত কাটাতে যাননি ও বাড়িতে। দেখলেন তো ওঁর অবস্থা। হলধরের যা হয়েছিল, এঁরও ঠিক তাই। মরে একেবারে কাঠ, আর চোখ ঠিক সেইভাবে চাওয়া, সেই দৃষ্টি, সেই কড়িকাঠের দিকে।'.....

আমি মনে মনে বললাম, না, মরে কাঠ নয়। মরে কী হয়েছেন অনাথবাবু তা আমি জানি। কালও সকালে গেলে দেখতে পাব তাঁকে—গায়ে কালো কোট, পায়ে বুট জুতো—হালদারবাড়ির পুব দিকের জঙ্গল থেকে নিমের দাঁতন হাতে হাসতে হাসতে বেরিয়ে আসছেন। □

আমার নাম অনিরুদ্ধ বোস। আমার বয়স ঊনত্রিশ। এখনও বিয়ে করিনি। আজ আট বছর হল আমি কলকাতার একটা সদাগরি আপিসে চাকরি করছি। মাইনে যা পাই তাতে একা মানুষের দিব্যি চলে যায়। সর্দার শঙ্কর রোডে একটা ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়ে আছি, দোতলায় দু'খানা ঘর, দক্ষিণ খোলা। দু'বছরই হল একটা অ্যাম্বাসাডার গাড়ি কিনেছি—সেটা আমি নিজেই চালাই। আপিসের কাজের বাইরে একটু-আধটু সাহিত্য করার শখ আছে। আমার তিনখানা গল্প বাংলা মাসিক পত্রিকায় বেরিয়েছে, চেনা মহলে প্রশংসাও পেয়েছে। তবে এটা আমি জানি যে, কেবলমাত্র লিখে রোজগার করার মতো ক্ষমতা আমার নেই। গত কয়েক মাসে লেখা একদম হয়নি, তবে বই পড়েছি অনেক। আর তার সবই বাংলাদেশে নীলের চাষ সম্পর্কে। এ বিষয়ে এখন আমাকে একজন অথরিটি বলা চলে। কবে সাহেবরা এসে আমাদের দেশে প্রথম নীলের চাষ শুরু করল, আমাদের গ্রামের লোকদের উপর তারা কীরকম অত্যাচার করত, কীভাবে 'নীল বিদ্রোহ' হল, আর সব শেষে কীভাবে জার্মানি কৃত্রিম উপায়ে নীল তৈরি করার ফলে এদেশ থেকে নীলের পাট উঠে গেল—এ সবই এখন আমার নখদর্পণে। যে সাংঘাতিক অভিজ্ঞতার ফলে আমার মনে নীল সম্পর্কে এই কৌতূহল জাগল, সেটা বলার জন্যই আজ লিখতে বসেছি।

এখানে আগে আমার ছেলেবেলার কথা একটু বলা দরকার।

আমার বাবা মুঙ্গেরে নামকরা ডাক্তার ছিলেন। ওখানেই আমার জন্ম আর ওখানের এক মিশনারি স্কুলে আমার ছেলেবেলার পড়াশুনা। আমার এক দাদা আছেন, আমার চেয়ে পাঁচ বছরের বড়। তিনি বিলেতে গিয়ে ডাক্তারি পাশ করে লন্ডনের কাছেই গোল্ডার্স গ্রিন বলে একটা জায়গায় হাসপাতালের সঙ্গে যুক্ত হয়ে কাজ করছেন; দেশে ফেরার বিশেষ ইচ্ছে আছে বলে মনে হয় না। আমার যখন ষোলো বছর বয়স তখন বাবা মারা যান। তার কয়েকমাস পরেই আমি মা-কে নিয়ে কলকাতায় এসে আমার বড়মামার বাড়িতে উঠি। মামাবাড়িতে থেকেই আমি সেন্ট জেভিয়ার্স থেকে বি. এ. পাশ করি। তারপর একটা সাময়িক ইচ্ছে হয়েছিল সাহিত্যিক হবার, কিন্তু মা-র ধমকানিতে চাকরির চেষ্টা দেখতে হল। বড়মামার সুপারিশেই

চাকরিটা হল, তবে আমারও যে কিছুটা কৃতিত্ব ছিল না তা নয়। ছাত্র হিসেবে আমার রেকর্ডটা ভালই, ইংরিজিটাও বেশ গড়গড় করে বলতে পারি, আর তা ছাড়া আমার মধ্যে একটা আত্মনির্ভরতা ও স্মার্টনেস আছে যেটা ইন্টারভিউ-এর সময় আমাকে নিশ্চয়ই সাহায্য করেছিল।

মুঙ্গেরে ছেলেবেলার কথাটা বললে হয়তো আমার চরিত্রের একটা দিক বুঝতে সাহায্য করবে। কলকাতায় একনাগাড়ে বেশিদিন থাকতে আমার প্রাণ হাঁপিয়ে ওঠে। এত লোকের ভিড়, ট্রামবাসের ঘরঘরানি, এত হইহল্লা, জীবনধারণের এত সমস্যা—মাঝে মাঝে ইচ্ছে করে এইসবের থেকে ছুটে বেরিয়ে চলে যাই। আমার গাড়িটা কেনার পর কয়েকবার এটা করেওছি। ছুটির দিনে একবার ডায়মন্ডহারবারে, একবার পোর্টক্যানিং, আর একবার দমদমের রাস্তা দিয়ে সেই একেবারে হাসনাবাদ পর্যন্ত ঘুরে এসেছি। একাই গিয়েছি প্রতিবার, কারণ এ ধরনের আউটিং-এ উৎসাহ প্রকাশ করার মতো কাউকে খুঁজে পাইনি।

এ থেকে বোঝাই যাবে যে, কলকাতা শহরে সত্যি করে বন্ধু বলতে আমার তেমন কেউ নেই। তাই প্রমোদের চিঠিটা পেয়ে মনটা খুশিতে ভরে উঠল। প্রমোদ ছিল আমার মুঙ্গেরের সহপাঠী। আমি কলকাতায় চলে আসার পর বছর চারেক আমাদের মধ্যে চিঠি লেখালেখি চলেছিল, তারপর বোধহয় আমার দিক থেকেই সেটা বন্ধ হয়ে যায়। হঠাৎ একদিন আপিস থেকে ফিরতেই চাকর গুরুদাস বলল মামাবাড়ি থেকে লোক এসে একটা চিঠি দিয়ে গেছে। খামের উপর লেখা দেখেই বুঝলাম প্রমোদ। দুমকা থেকে লিখছে—'জংলি আপিসে চাকরি করছি...কোয়ার্টার্স আছে...দিন সাতেকের ছুটি নিয়ে চলে আয়...।'

ছুটি পাওনা ছিল বেশ কিছুদিনের, তাই যত শীঘ্র সম্ভব আপিসের কাজ গুছিয়ে নিয়ে, গত ২৭শে এপ্রিল—তারিখটা আজীবন মনে থাকবে—তল্পিতল্পা গুটিয়ে, কলকাতার জঞ্জাল ও ঝঞ্ঝাট পিছনে ফেলে রওনা দিলাম দুমকার উদ্দেশে।

প্রমোদ অবিশ্যি মোটরযোগে দুমকা যাবার কথা একবারও বলেনি। ওটা আমারই আইডিয়া। দু'শো মাইল রাস্তা, বড়জোর পাঁচ-সাড়ে পাঁচ ঘণ্টার ধাক্কা। দশটার মধ্যে ভাত খেয়ে বেরিয়ে পড়ব, দিনের আলো থাকতে থাকতে পৌঁছে যাব, এই ছিল মতলব।

কাজের বেলা গোড়াতেই একটা হোঁচট খেতে হল। রান্না তৈরি ছিল ঠিক সময়, কিন্তু ভাত খেয়ে সবে মুখে পানটা পুরেছি, এমন সময় বাবার পুরনো বন্ধু মোহিতকাকা এসে হাজির। একে ভারভার্তিক লোক, তার উপর প্রায় দশ বছর পরে দেখা; মুখ ফুটে কিছুতেই বলতে পারলাম না আমার তাড়া আছে। ভদ্রলোককে চা খাওয়াতে হল, তারপর ঝাড়া একঘণ্টা ধরে তাঁর সুখদুঃখের কাহিনী শুনতে হল।

মোহিতকাকাকে বিদায় দিয়ে গাড়িতে মাল তুলে যখন নিজে উঠতে যাচ্ছি, তখন দেখি আমার একতলার ভাড়াটে ভোলাবাবু তাঁর চার বছরের ছেলে পিণ্টুর হাত ধরে

কোত্থেকে যেন বাড়ি ফিরছেন। আমায় দেখে বললেন, 'একা একা কোথায় পাড়ি দিচ্ছেন?'

আমার উত্তর শুনে ভদ্রলোক একটু উদ্বিগ্নভাবেই বললেন, 'এতটা পথ মোটরে একা যাবেন? অন্তত এই ট্রিপটার জন্য একটা ড্রাইভার-ট্রাইভারের বন্দোবস্ত করলে হত না?'

আমি বললাম, 'চালক হিসেবে আমি খুব হুঁশিয়ার, আর আমার যত্নের ফলে গাড়িটাও প্রায় নতুনই রয়েছে, তাই ভাবনার কিছু নেই।' ভদ্রলোক 'বেস্ট অফ লাক' বলে ছেলের হাত ধরে বাড়ির ভিতর ঢুকে পড়লেন।

গাড়িতে স্টার্ট দেবার আগে হাতঘড়ির দিকে চেয়ে দেখি—পৌনে এগারোটা।

হাওড়া দিয়ে না গিয়ে বালি ব্রিজের রাস্তা নেওয়া সত্ত্বেও, চন্দননগর পৌঁছতেই লাগল দেড় ঘণ্টা। এই তিরিশটা মাইল পেরোতে এত ঝক্কি, রাস্তা এত বাজে ও আনরোমান্টিক যে, মোটরযাত্রার প্রায় ষোলো আনা উৎসাহ উবে যায়। কিন্তু তার ঠিক পরেই শহর পিছনে ফেলে গাড়ি যখন ছোটে মাঠের মধ্যে দিয়ে, তখন সেটা কাজ করে একেবারে ম্যাজিকের মতো। মন তখন বলে—এর জন্যই তো আসা! কোথায় ছিল অ্যাদ্দিন এই চিমনির ধোঁয়া-বর্জিত মসৃণ আকাশ, এই মাটির গন্ধ মেশানো মনমাতানো বিশুদ্ধ মেঠো বাতাস?

দেড়টা নাগাদ যখন বর্ধমানের কাছাকাছি পৌঁছেছি, তখন পেটে একটা খিদের ভাব অনুভব করলাম। সঙ্গে কমলালেবু আছে, ফ্লাস্কে গরম চা আছে, কিন্তু মন চাইছে অন্য কিছু। রাস্তার পাশেই স্টেশন; গাড়ি থামিয়ে রেস্টোর‍্যান্টে গিয়ে দুটো টোস্ট, একটা অমলেট ও এক পেয়ালা কফি খেয়ে আবার রওনা দিলাম। পথ বাকি এখনও একশো তিরিশ মাইল।

বর্ধমান থেকে পঁচিশ মাইল গিয়ে পানাগড় পড়ে। সেখান থেকে গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক রোড ছেড়ে ইলামবাজারের রাস্তা নিতে হবে। ইলামবাজার থেকে সিউড়ি হয়ে ম্যাসানজোর পেরিয়ে দুমকা।

পানাগড়ের মিলিটারি ক্যাম্পগুলো সবে দৃষ্টিগোচর হয়েছে, এমন সময় আমার গাড়ির পিছনের দিক থেকে একটা বেলুন ফাটার মতো শব্দ হল, আর সেইসঙ্গে গাড়িটা একপাশে একটু কেদ্‌রে গেল। কারণ অবিশ্যি সহজেই বোধগম্য।

গাড়ি থেকে নেমে সামনের দিকে চেয়ে বুঝতে পারলাম শহর এখনও কয়েক মাইল দূরে। কাছাকাছির মধ্যে মেরামতির দোকানের আশাটা মন থেকে মুছে ফেলতে হল। সঙ্গে যে 'স্টেপনি' ছিল না তা নয়, আর জ্যাক দিয়ে গাড়ি তুলে ফাটা টায়ার খুলে ফেলে তার জায়গায় নতুন টায়ার পরানো আমার অসাধ্য কিছু নয়। তবু, এক্ষেত্রে পরিশ্রম এড়ানোর ইচ্ছেটা অস্বাভাবিক নয়। আর গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক রোডের মাঝখানে দাঁড়িয়ে গাড়িতে টায়ার পরাব—পাশ দিয়ে হুশ্ হুশ্ করে অন্য কত গাড়ি

বেরিয়ে যাবে, আর আমার শোচনীয় হাস্যকর অবস্থাটা তারা দেখে ফেলবে—এটা ভাবতে মোটেই ভাল লাগছিল না। কিন্তু কী আর করা? দশ মিনিট এদিক-ওদিক চেয়ে ঘোরাফেরা করে গঙ্গা বলে কাজে লেগে পড়লাম।

নতুন টায়ার লাগিয়ে ফাটা টায়ার ক্যারিয়ারে ভরে ডালা বন্ধ করে যখন সোজা হয়ে উঠে দাঁড়ালাম, তখন শার্টটা ঘামে ভিজে শরীরের সঙ্গে সেঁটে গেছে। ঘড়িতে দেখি আড়াইটা বেজে গেছে। আবহাওয়াতে একটা গুমোট ভাব। ঘণ্টাখানেক আগেও সুন্দর হাওয়া বইছিল; গাড়ি থেকে দেখছিলাম বাঁশঝাড়ের মাথাগুলো নুয়ে নুয়ে পড়ছে। এখন চারিদিক থমথমে। গাড়িতে ওঠার সময় পশ্চিমের আকাশে নীচের দিকে দূরের গাছপালার মাথায় একটা কালচে নীলের আভাস লক্ষ করলাম। মেঘ। ঝড়ের মেঘ কি? কালবৈশাখী? ভেবে লাভ নেই। স্পিডোমিটারের কাঁটা আরও চড়াতে হবে। ফ্লাস্কটা খুলে খানিকটা গরম চা মুখে ঢেলে আবার রওনা দিলাম।

ইলামবাজার পেরোতে না পেরোতেই ঝড়টা এসে পড়ল। ঘরে বসে যে জিনিস চিরকাল সানন্দে উপভোগ করেছি—যার সঙ্গে তাল মিলিয়ে ভাব মিলিয়ে রবীন্দ্রনাথের কবিতা আবৃত্তি করেছি, গান করেছি—সেই জিনিসই খোলা মাঠের মধ্যে পিচের রাস্তায় চলন্ত গাড়িতে যে কী বিভীষিকার সৃষ্টি করতে পারে তা কল্পনা করতে পারি না। ওটাকে প্রকৃতির একটা শয়তানি বলে মনে হয়। অসহায় মানুষকে এক নির্মম রসিকতায় নাজেহাল করার ভাব নিয়ে যেন এই বাজের খেলা। এদিকে-ওদিকে আচমকা বৈদ্যুতিক শরনিক্ষেপ, আর পরমুহূর্তেই কর্ণপটাহ বিদীর্ণ করা দামামা গর্জন—গুড় গুড় গুড় গুড় কড়কড় কড়াৎ! এক এক সময় মনে হচ্ছে যে, আমার এই নিরীহ অ্যাম্বাসাডার গাড়িকেই তাগ করে বিদ্যুৎবাণ নিক্ষিপ্ত হচ্ছে, এবং আরেকটু মনোযোগ দিয়ে কাজটা করলেই লক্ষ্যভেদ হয়ে যাবে।

এই দুর্যোগের মধ্যেই কোনওমতে যখন সিউড়ি ছাড়িয়ে ম্যাসানজোরের পথে পড়েছি, তখন হঠাৎ একটা বিস্ফোরণের শব্দ হল যেটাকে কোনওমতেই বজ্রপাত বলে ভুল করা চলে না। বুঝলাম আমার গাড়ির আরেকটি টায়ার কাজে ইস্তফা দিলেন।

হাল ছেড়ে দিলাম। মুষলধারে বৃষ্টি শুরু হয়েছে। ঘড়িতে সাড়ে পাঁচটা। গত বিশ মাইল স্পিডোমিটারের কাঁটাকে পনেরো থেকে পঁচিশের মধ্যে রাখতে হয়েছে। না হলে এতক্ষণ ম্যাসানজোর ছাড়িয়ে যাবার কথা। কোথায় এসে পৌঁছলাম? সামনের দিকে চেয়ে কিছু বোঝার উপায় নেই। কাচের উপর জলপ্রপাত। ওয়াইপারটা সপাৎ সপাৎ শব্দ করে চলেছে, কিন্তু সেটাকে কাজ না বলে খেলা বলাই ভাল। নিয়মমতো এপ্রিল মাসে এখনও সূর্যের আলো থাকার কথা, কিন্তু ভাব দেখে মনে হয় রাত হল বলে!

আমার ডানপাশের দরজাটা একটু ফাঁক করে বাইরের দিকে চাইলাম। যা দেখলাম

তাতে মনে হল কাছাকাছির মধ্যে ঘন বসতি না থাকলেও, দু-একটা পাকাবাড়ি যেন গাছপালার ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে। গাড়ি থেকে নেমে যে একটু এদিক-ওদিক ঘুরে দেখব তার উপায় নেই। তবে সেটা না দেখেও যে জিনিসটা বলা যায় সেটা হল এই যে, মাইলখানেকের মধ্যে বাজার বা দোকান বলে কোনও পদার্থ নেই।

আর আমার সঙ্গো বাড়তি টায়ারও আর নেই।

মিনিট পনেরো গাড়িতে বসে থাকার পর একটা প্রশ্ন মনে জাগল; এতখানি সময়ের মধ্যে একটি গাড়ি বা একটি মানুষও আমার গাড়ির পাশ দিয়ে গেল না। তবে কি ভুল পথে এসে পড়েছি? সঙ্গো রোড ম্যাপ আছে। সিউড়ি পর্যন্ত ঠিকই এসেছি জানি, কিন্তু তারপরে যদি কোনও ভুল রাস্তায় মোড় ঘুরে থাকি? এই চোখধাঁধানো বৃষ্টিতে সেটা খুব অস্বাভাবিক নয়।

কিন্তু যদি ভুল হয়ে থাকে—এটা তো আফ্রিকা বা দক্ষিণ আমেরিকার জঙ্গাল নয় যে, দিশেহারা হয়ে পড়তে হবে! যেখানেই এসে থাকি না কেন, এটা বীরভূমেরই মধ্যে, শান্তিনিকেতন থেকে মাইল পঞ্চাশের বেশি দূর নয়, বৃষ্টি থামলেই সব মুশকিল আসান হয়ে যাবে, এমনকী হয়তো মাইলখানেকের মধ্যে একটা গাড়ি মেরামতের দোকানও পেয়ে যাব।

পকেট থেকে উইল্‌স-এর প্যাকেট আর দেশলাই বার করে একটা সিগারেট ধরালাম। ভোলাবাবুর কথা মনে পড়ল। ভদ্রলোক নিশ্চয়ই ভুক্তভোগী—নইলে এমন খাঁটি উপদেশ দেন কী করে? ভবিষ্যতে—

প্যাঁ—ক্ প্যাঁ—ক্ প্যাঁ—ক্!

একটা তন্দ্রার ভাব এসে গিয়েছিল, হর্নের শব্দে সজাগ হয়ে উঠে বসলাম। বৃষ্টিটা একটু ধরেছে। তবে অন্ধকারে গাঢ়তর।

প্যাঁ—ক্ প্যাঁ—ক্ প্যাঁ—ক্!

পিছন ফিরে দেখি একটা লরি এসে দাঁড়িয়েছে। হর্ন দিচ্ছে কেন? আমি কি রাস্তার পুরোটা দখল করে আছি নাকি?

দরজা খুলে নেমে দেখি লরির দোষ নেই। টায়ার ফাটার সময় গাড়িটা খানিকটা ঘুরে গিয়ে রাস্তার পুরোটা না হলেও প্রায় আধখানা আটকে রেখেছে—লরি যাবার জায়গা নেই।

'গাড়ি সাইড কিজিয়ে—সাইড কিজিয়ে!'

আমার অসহায় ভাব দেখেই বোধ হয় পাঞ্জাবি ড্রাইভারটি নেমে এলেন।

'কেয়া হুয়া? পাংচার?'

আমি ফরাসি কায়দায় কাঁধ দুটোকে একটু উঁচিয়ে আমার শোচনীয় অবস্থা বুঝিয়ে দিলাম। বললাম, 'আপনি যদি একটু হাত লাগান তা হলে এটাকে একপাশে সরিয়ে আপনার যাবার জায়গা করে দিতে পারি।'

এবার লরি থেকে পাঁইজির সহকারী নেমে এলেন। তিনজনে ঠেলে স্টিয়ারিং ঘুরিয়ে গাড়িটাকে একপাশে করে দিলাম। তারপর জিজ্ঞেস করে জানলাম যে, এটা দুমকার রাস্তা নয়। আমি ভুল পথে এসে গেছি, তবে সেটা মাইল তিনেকের বেশি নয়। কাছাকাছির মধ্যে সারানোর কোনও দোকান নেই।

লরি চলে গেল। তার ঘরঘর শব্দ মিলিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে একটা বিশাল নৈঃশব্দ্যের সৃষ্টি হল, আর আমি বুঝলাম যে, আমি অকূল পাথারে পড়েছি।

আজ রাত্রের মধ্যে দুমকা পৌঁছনোর বিন্দুমাত্র সম্ভাবনা নেই, এবং রাতটা কীভাবে কাটবে তার কোনও ইঙ্গিত নেই।

আশেপাশের ডোবা থেকে ব্যাঙের কোরাস আরম্ভ হয়েছে। বৃষ্টিটা কমের দিকে। অন্য সময় হলে মাটির সোঁদা গন্ধে মনটা মেতে উঠত, কিন্তু এ অবস্থায় নয়!

আবার গাড়িতে উঠলাম। কিন্তু তাতেই বা কী লাভ? হাত পা ছড়িয়ে আরাম করার পক্ষে অ্যাম্বাসাডার গাড়ির মতো অনুপযুক্ত আর কিছু আছে কি? বোধ হয়, না।

আরেকটা সিগারেট ধরাতে যাব, এমন সময় হঠাৎ পাশের জানলা দিয়ে একটা ক্ষীণ আলো এসে স্টিয়ারিং হুইলটার উপর পড়ল। আবার দরজা খুলে গলা বাড়িয়ে দেখি গাছের ফাঁক দিয়ে একটা আলোর চতুষ্কোণ দেখা যাচ্ছে। বোধহয় জানলা। ধোঁয়ার কারণ আগুন, কেরোসিনের আলোর কারণ মানুষ। কাছাকাছি বাড়ি আছে, এবং তাতে মানুষ আছে।

টর্চটা নিয়ে গাড়ি থেকে নেমে পড়লাম। আলোর দূরত্ব বেশি নয়। আমার উচিত এগিয়ে গিয়ে অনুসন্ধান করা। একটা রাস্তাও রয়েছে, অপরিসর পথ, সেটা বোধহয় আলোরই দিক থেকে, আমি যে রাস্তায় আছি সেটায় এসে পড়েছে। পথের দু'পাশে গাছপালার বন, তলার দিকে আগাছার জঙ্গল।

কুছ পরোয়া নেহি। গাড়ির দরজা লক্ করে রওনা দিলাম।

যতদূর সম্ভব খানাখন্দ বাঁচিয়ে জলকাদার মধ্যে দিয়ে ছপাৎ ছপাৎ করে খানিকদূর হেঁটে একটা তেঁতুলগাছ পেরোতেই বাড়িটা চোখে পড়ল। বাড়ি বলা ভুল হবে—একখানা কি দেড়খানা ইটের ঘরের উপর একটা টিনের চালা। ফাঁক করা দরজা দিয়ে ঘরের ভিতর একটা জ্বালানো লণ্ঠন, একটা ধোঁয়াটে ভাব, আর একটা খাটিয়ার কোণ লক্ষ করলাম।

'কোই হ্যায়?'

একটা মাঝবয়সি বেঁটে গোঁফওয়ালা লোক বেরিয়ে এসে আমার টর্চের আলোর দিকে ভুরু কুঁচকে চাইল। আমি আলোটা নামিয়ে নিলাম।

'কাঁহাসে আয়া বাবু?'

আমার দুর্ঘটনার কথা সংক্ষেপে বর্ণনা করে বললাম, 'এখানে কাছাকাছির মধ্যে রাত কাটানোর কোনও বন্দোবস্ত হতে পারে? যা পয়সা লাগে আমি দেব।'

'ডাকবাংলামে?'

ডাকবাংলো? সে আবার কোথায়?

প্রশ্নটা মনে আসার সঙ্গে সঙ্গেই আমার বোকামোটা বুঝতে পারলাম। এতক্ষণ কেবল লণ্ঠন আর টর্চের আলোর দিকে দৃষ্টি থাকার ফলে আশেপাশে কী আছে দেখিইনি। এবার টর্চটাকে ঘুরিয়ে আমার বাঁ দিকে ফেলতেই একটা বেশ বড় একতলা পুরনো বাড়ি চোখে পড়ল। সেটা দেখিয়ে বললাম, 'এটাই ডাকবাংলো?'

'হাঁ বাবু। লেকিন বিস্তারা-উস্তারা কুছ নেহি হ্যায়, খানা ভি নেহি মিলেগা।'

'বিছানা আমার সঙ্গে আছে। খাট হবে তো?'

'খাটিয়া হোগা।'

'আর তোমার ঘরে তো উনুন ধরিয়েছ দেখছি। তুমি নিজে খাবে নিশ্চয়ই।'

লোকটা হেসে ফেলল। তার হাতের সেঁকা মোটা রুটি, আর তার বউয়ের রান্না উরুৎ কা ডাল কি আমার চলবে? বললাম, খুব চলবে। সবরকম রুটিই আমার চলে, আর উরুৎ কা ডাল তো আমার অতি প্রিয় খাদ্য!

এককালে কী ছিল জানি না, এখন নামেই ডাকবাংলো। তবে পুরনো সাহেবি আমলের বাড়ি, তাই ঘরের সাইজ বড় আর সিলিংটা পেল্লায় উঁচু। আসবাব বলতে একটি পুরনো নেয়ারের খাট, একপাশে একটা টেবিল, আর তার সামনে হাতল-ভাঙা একটা চেয়ার।

চৌকিদার আমার জন্য একটা লণ্ঠন জ্বালিয়ে এনে টেবিলের উপর রাখল। বললাম, 'তোমার নাম কী হে?'

'সুখনরাম, বাবুজি।'

'এ বাংলোয় লোকজন কোনওকালে এসেছে, না আমিই প্রথম?'

সুখনরামের রসবোধ আছে। সে হেসে ফেলল। বললাম, 'ভূতটুত নেই তো?'

'আরে রাম, রাম! কত লোকই তো এসে থেকে গেছে। —কই, এমন অপবাদ তো কেউ দেয়নি।'

এ-কথায় একটু যে আশ্বস্ত হইনি তা বলতে পারি না। ভূতে বিশ্বাস করি বা না করি, এটুকু অন্তত জানি যে, যদি ভূত থাকেই এ বাংলোতে, তা হলে সে সবসময়ই থাকবে, আর না থাকলে কোনও সময়ই থাকবে না। বললাম, 'এটা কদ্দিনের পুরনো বাড়ি?'

সুখন আমার বেডিং খুলে দিতে দিতে বলল, 'পহিলে ইয়ে নীল কোঠি থা। এক নীলকা ফেক্টরি ভি থা নজদিগমে। উস্‌কা এক চিমনি আভি তক্ খাড়া হ্যায়; আউর সব টুট গিয়া।'

এ অঞ্চলে যে এককালে নীলের চাষ হত সেটা জানতাম। মুঙ্গেরের আশেপাশেও ছেলেবেলায় পুরনো ভাঙা নীলকুঠি দেখেছি।

সুখনের তৈরি রুটি আর কলাইয়ের ডাল খেয়ে নেয়ারের খাটে বিছানা পেতে যখন শুলাম তখন রাত সাড়ে দশটা। প্রমোদকে আজ বিকেলে পৌঁছব বলে টেলিগ্রাম করেছিলাম, ও একটু চিন্তিত হবে অবশ্যই। কিন্তু সে নিয়ে ভেবে লাভ নেই। একটা আস্তানা যে পেয়েছি, এবং বেশ সহজেই পেয়েছি, সেটা কম ভাগ্যের কথা নয়! ভবিষ্যতে ভোলাবাবুর উপদেশ মেনে চলব। উচিত শিক্ষা হয়েছে আমার। তবে এটাও ঠিক যে, এমনি শেখার চেয়ে ঠেকে শেখার দাম অনেক বেশি।

লণ্ঠনটা পাশের বাথরুমে রেখে এসেছি। দরজার ফাঁক দিয়ে যেটুকু আলো এসেছে তাই যথেষ্ট। ঘরে বেশি আলো থাকলে আমার ঘুম আসে না, অথচ এখন যে জিনিসটার সবচেয়ে বেশি দরকার সেটা হল ঘুম। গাড়ি থেকে জিনিসপত্র সব বার করে নিয়ে সেটা লক করে এসেছি, বলাই বাহুল্য। এটুকু জোর গলায় বলতে পারি যে, আজকালকার দিনে কলকাতার রাস্তায় গাড়ি ফেলে রাখা যতটা বিপজ্জনক, গ্রামের রাস্তায় তার চেয়ে হয়তো কিছুটা কমই।

বাইরে বৃষ্টির শব্দ থেমে গেছে। ব্যাঙ আর ঝিঁঝির সমবেত কণ্ঠস্বরে রাত মুখর হয়ে উঠেছে। শহরের জীবনটা এত দূরে আর এত পিছনে সরে গেছে যে, সেটাকে একটা প্রাগৈতিহাসিক পর্ব বলে মনে হচ্ছে। নীলকুঠি! .....দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' নাটকের কথা মনে পড়ল। কলেজে থাকতে অভিনয় দেখেছিলাম...কর্ণওয়ালিস স্ট্রিটের কোনও এক পেশাদারি থিয়েটারে.....

ঘুমটা হঠাৎ ভেঙে গেল। কতক্ষণ পরে তা জানি না।

দরজায় একটা খচমচ শব্দ হচ্ছে। ভেতরে হুড়কো দেওয়া; বুঝলাম বাইরে থেকে কুকুর বা শেয়াল জাতীয় একটা কিছু নখ দিয়ে সেটাকে আঁচড়াচ্ছে। মিনিটখানেক পরে আওয়াজটা থেমে গেল। আবার সব চুপচাপ।

চোখ বুজলাম, কিন্তু সে অল্পক্ষণের জন্য। একটা কুকুরের ডাকে ঘুমটা একেবারে গেল।

বাংলার গ্রাম্য নেড়িকুত্তার ডাক এটা নয়। এ হল বিলিতি হাউন্ডের হুঙ্কার। এ ডাক আমার অচেনা নয়। মুঙ্গেরে আমাদের বাড়ির দুটো বাড়ি পরেই মার্টিন সাহেবের বাড়ি থেকে রাত্রে এ ডাক শুনতে পেতাম। এ তল্লাটে এমন কুকুর কে পুষবে? একবার মনে হল উঠে গিয়ে দরজা খুলে দেখি—কারণ কুকুরটা ডাকবাংলোর খুব কাছেই রয়েছে বলে মনে হচ্ছে। তারপর মনে হল, সামান্য একটা কুকুরের ডাক নিয়ে এতটা মাথা ঘামানোর কোনও মানেই হয় না। তার চেয়ে আবার ঘুমনোর চেষ্টা করে দেখা যাক। রাত ক'টা হল?

জানলা দিয়ে অল্প চাঁদের আলো আসছে। শোয়া অবস্থাতেই বাঁ হাতটা তুলে মুখের সামনে আনতেই বুকটা ধড়াস করে উঠল।

হাতে ঘড়ি নেই!

অথচ অটোম্যাটিক ঘড়ি যত পরে থাকা যায় ততই ভাল বলে ওটা শোয়ার সময় কখনও খুলে শুই না। ঘড়ি কোথায় গেল? শেষটায় কি ডাকাতের আস্তানায় এসে পড়লাম নাকি? তা হলে আমার গাড়ির কী হবে?

বালিশের পাশে হাতড়িয়ে টর্চটা খুঁজতে গিয়ে দেখি সেটাও নেই।

একলাফে বিছানা থেকে উঠে মাটিতে হাঁটু গেড়ে বসে খাটের নিচে তাকিয়ে দেখি সুটকেসটাও উধাও।

মাথা গরম হয়ে এল। এর একটা বিহিত করতেই হবে। হাঁক দিলাম—'চৌকিদার।'

কোনও উত্তর নেই।

বারান্দায় যাব বলে দরজার দিকে এগিয়ে খেয়াল হল যে হুড়কোটাকে যেমনভাবে লাগিয়ে শুয়েছিলাম, ঠিক তেমনই আছে। জানলাতেও গরাদ—তবে চোর এল কোথা দিয়ে?

দরজার হুড়কোটা খুলতে আমার নিজের হাতের উপর চোখ পড়ে কেমন জানি খট্‌কা লাগল।

হাতে কি দেয়াল থেকে চুন লেগেছে—না পাউডার জাতীয় কিছু? এমন ফ্যাকাশে লাগছে কেন?

আর আমি তো গেঞ্জি পরে শুয়েছিলাম—তা হলে আমার গায়ে লম্বাহাতা সিল্কের শার্ট কেন?

মাথা ঝিমঝিম করতে লাগল। দরজা খুলে বাইরে এলাম।

'ছাউখিডা-র!'

নিজের গলার স্বর চিনতে পারলাম না। উচ্চারণও না। যতই মিশনারি ইস্কুলে পড়ি না কেন—বাংলা উচ্চারণে উগ্র সাহেবিয়ানা আমার কোনওদিন ছিল না।

আর চৌকিদারই বা কোথায়, আর কোথায়ই বা তার ঘর! বাংলোর সামনে ধু-ধু করছে মাঠ। দূরে আবছা একটা বাড়ি দেখা যাচ্ছে, তার পাশে একটা চিমনির মতন স্তম্ভ। চারিদিকে অস্বাভাবিক নিস্তব্ধতা।

আমার পরিবেশ বদলে গেছে।

আমি নিজেও বদলে গেছি।

ঘর্মাক্ত অবস্থায় ঘরে ফিরে এলাম। চোখটা অন্ধকারে অভ্যস্ত হয়ে গেছে। ঘরের সব কিছুই এখন দেখতে পাচ্ছি। খাট আছে—তাতে মশারি নেই—অথচ আমি মশারি টাঙিয়ে শুয়েছিলাম। বালিশ যেটা রয়েছে সেটাও আমার নয়। আমারটা ছিল সাধারণ, এটার পাশে বাহারের কুঁচি দেওয়া বর্ডার। খাটের ডান দিকের দেয়ালের সামনে সেই টেবিল, সেই চেয়ার—কিন্তু তাতে প্রাচীনত্বের কোনও চিহ্ন নেই। আবছা আলোতেও তার বার্নিশ করা কাঠটা চকচক করছে। টেবিলের উপর রাখা রয়েছে—লণ্ঠন নয়—বাহারের শেডওয়ালা কাজ করা কেরোসিন ল্যাম্প।

আরও জিনিসপত্র রয়েছে ঘরে—সেগুলো ক্রমে দৃষ্টিগোচর হল। এক কোনায় দুটো ট্রাঙ্ক। দেয়ালে একটা আলনা, তা থেকে ঝুলছে একটা কোট, একটা অদ্ভুত অচেনা ধরনের টুপি, আর একটা হান্টার চাবুক। আলনার নীচে একজোড়া হাঁটু অবধি উঁচু জুতো—যাকে বলে goloshes।

জিনিসপত্র ছেড়ে আরেকবার আমার নিজের দিকে দৃষ্টি দিলাম। এর আগে শুধু সিল্কের শার্টটা লক্ষ করেছিলাম। এখন দেখলাম তার নীচে রয়েছে সরু চাপা প্যান্ট। আরও নীচে মোজা। পায়ে জুতো নেই, তবে খাটের পাশেই দেখলাম একজোড়া কালো চামড়ার বুট রাখা রয়েছে।

আমার ডান হাতটা এবার আমার মুখের উপর বুলিয়ে বুঝতে পারলাম, শুধু গায়ের রঙ ছাড়াও আমার চেহারার আরও পরিবর্তন হয়েছে। এত চোখা নাক, এত পাতলা ঠোঁট আর সরু চোয়াল আমার নয়। মাথায় হাত দিয়ে দেখি ঢেউখেলানো চুল পিছনে কাঁধ অবধি নেমে এসেছে। কানের পাশে ঝুলপি নেমে এসেছে প্রায় চোয়াল পর্যন্ত।

বিস্ময় ও আতঙ্কের সঙ্গে সঙ্গে একটা উগ্র কৌতূহল হল আমার নিজের চেহারাটা দেখার জন্য। কিন্তু আয়না? আয়না কোথায়?

রুদ্ধশ্বাসে দৌড়ে গিয়ে এক ধাক্কায় বাথরুমের দরজাটা খুলে ভিতরে ঢুকলাম।

আগে দেখেছিলাম একটিমাত্র বালতি ছাড়া সেখানে আর কিছু নেই। এখন দেখি মেঝের এককোণে একটা টিনের বাথটব, তার পাশে চৌকি আর এনামেলের মগ। যে জিনিসটা খুঁজছিলাম সেটা রয়েছে আমার ঠিক সামনেই—একটা কাঠের ড্রেসিং টেবিলের উপর লাগানো একটা ওভাল শেপের আয়না। আমি জানি আমি আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে আছি—কিন্তু যে চেহারাটা তাতে প্রতিফলিত হয়েছে সেটা আমার নয়। কোনও এক বীভৎস ভৌতিক ভেলকির ফলে আমি হয়ে গেছি ঊনবিংশ শতাব্দীর একজন সাহেব—তার গায়ের রঙ ফ্যাকাশে ফরসা, চুল সোনালি, চোখ কটা এবং সে চোখের চাহনিতে ক্লেশের সঙ্গে কাঠিন্যের ভাব অদ্ভুত ভাবে মিশেছে। কত বয়স এ সাহেবের? ত্রিশের বেশি নয়, তবে দেখে মনে হয় অসুস্থতা কিংবা অতিরিক্ত পরিশ্রমের জন্য অকালেই বার্ধক্যের ছাপ পড়েছে।

কাছে গিয়ে আরও ভাল করে 'আমার' মুখটা দেখলাম। চেয়ে থাকতে থাকতে একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস বুকের ভিতর থেকে উঠে এল।

'ওঃ!'

এ কণ্ঠস্বর আমার নয়। এই দীর্ঘশ্বাসও সাহেবেরই মনের ভাব ব্যক্ত করছে—আমার নয়।

এর পরে যা ঘটল, তাতে বুঝলাম যে, শুধু গলার স্বর নয়, আমার হাত পা সবই অন্য কারুর অধীনে কাজ করছে। কিন্তু আশ্চর্য এই যে, আমি—অনিরুদ্ধ বোস—যে বদলে গেছি—সে জ্ঞানটা আমার আছে। অথচ এই পরিবর্তনটা ক্ষণস্থায়ী না চিরস্থায়ী, এ থেকে নিজের অবস্থায় ফিরে আসার কোনও উপায় আছে কিনা, তা আমার জানা নেই।

বাথরুম থেকে শোয়ার ঘরে ফিরে এলাম।

আবার রাইটিং টেবিলের দিকে চোখ পড়ল। ল্যাম্পটা এখন জ্বলছে। ল্যাম্পের নীচে খোলা অবস্থায় একটা চামড়া দিয়ে বাঁধানো খাতা। তার পাশে একটা দোয়াতে ডোবানো রয়েছে একটা খাগের কলম।

টেবিলের দিকে এগিয়ে গেলাম। খাতার খোলা পাতায় কিছু লেখা হয়নি। কোনও এক অদৃশ্য শক্তি আমাকে চেয়ারে বসিয়ে দোয়াত থেকে কলমটা আমার ডান হাত দিয়ে তুলিয়ে দিল। সে হাত এবার বাঁ দিকে সাদা পাতার দিকে অগ্রসর হল। ঘরের নিস্তব্ধতা ভেদ করে খসখস করে শব্দ করে খাগের কলম লিখে চলল ঃ

২৭শে এপ্রিল, ১৮৬৮

কানের কাছে আবার সেই রাক্ষুসে মশার বিনবুনুনি আরম্ভ হয়েছে। শেষটায় এই সামান্য একটা পোকার হাতে আমার মতো একটা জাঁদরেল ব্রিটিশারকে পরাহত হতে হল? ভগবানের এ কেমন বিধি? এরিক পালিয়েছে। পার্সি আর টোনিও আগেই ভেগেছে। আমার বোধহয় এদের চেয়েও বেশি টাকার লোভ, তাই বারবার ম্যালেরিয়ার আক্রমণ সত্ত্বেও নীলের মোহ কাটাতে পারিনি। না—শুধু তাই নয়। ডায়রিতে মিথ্যে কথা বলা পাপ। আরেকটা কারণ আছে। আমার দেশের লোক আমাকে হাড়ে হাড়ে চেনে। সেখানে থাকতেও তো কম কুকীর্তি করিনি—আর তারা সে-কথা ভোলেওনি। তাই ইংল্যান্ডে ফিরে যাবার সাহস নেই। বুঝতে পারছি এখানেই থাকতে হবে। আর এখানেই মরতে হবে। মেরি আর আমার তিন বছরের শিশুসন্তান টোবির কবরের পাশেই আমার স্থান হবে। এত অত্যাচার করেছি এখানকার স্থানীয় নেটিভদের উপর যে, আমার মৃত্যুতে চোখের জল ফেলার মতো একটি লোকও নেই এখানে। এক যদি মীরজান কাঁদে। আমার বিশ্বস্ত অনুগত বেয়ারা মীরজান!

আর রেক্স—আসল ভাবনা তো রেক্সকে নিয়েই। হায় প্রভুভক্ত কুকুর! আমি মরে গেলে তোকে এরা আস্ত রাখবে না রে! হয় ঢিল মেরে, না হয় লাঠির বাড়ি মেরে তোর প্রাণ শেষ করবে এরা। তোর যদি একটা ব্যবস্থা করে যেতে পারতাম!.....

আর লিখতে পারলাম না। হাত কাঁপছে। আমার হাত নয়—ডায়রি-লেখকের।

কলম রেখে দিলাম।

এবার আমার ডান হাতটা টেবিলের উপর থেকে নেমে কোলের কাছে এসে ডান দিকে গেল।

একটা দেরাজের হাতল।

হাতের টানে দেরাজ খুলে গেল।

ভিতরে একটা পিনকুশন, একটা পিতলের পেপার ওয়েট, একটা পাইপ, কিছু কাগজপত্র।

আরও খানিকটা খুলে গেল দেরাজ। একটা লোহার জিনিস চকচক করে উঠল। পিস্তল! তার হাতলে হাতির দাঁতের কাজ।

আমার হাত পিস্তলটা বার করে নিল। হাতের কাঁপুনি থেমে গেল।

বাইরে শেয়াল ডাকছে। সেই শেয়ালের ডাকের প্রত্যুত্তরেই যেন গর্জিয়ে উঠল হাউন্ডের কণ্ঠস্বর—ঘেউ ঘেউ ঘেউ!

চেয়ার ছেড়ে উঠে দরজার দিকে গেলাম। দরজা খুলে বাইরে।

সামনের মাঠে চাঁদের আলো।

বাংলোর বারান্দা থেকে হাত বিশেক দূরে ছাই রঙের একটা প্রকাণ্ড গ্রে হাউন্ড ঘাসের উপর দাঁড়িয়ে আছে। আমি বাইরে আসামাত্র আমার দিকে ফিরে লেজ নাড়তে লাগল।

'রেক্স!'

সেই গম্ভীর ইংরেজ কণ্ঠস্বর। দূরে বাঁশবন ও নীলের ফ্যাক্টরির দিক থেকে ডাকটা প্রতিধ্বনিত হয়ে এল—রেক্স! ...রেক্স...

রেক্স এগিয়ে এল—তার লেজ নড়ছে।

ঘাস থেকে বারান্দায় ওঠার সঙ্গো সঙ্গো আমার ডান হাত কোমরের কাছে উঠে এল—পিস্তলের মুখ কুকুরের দিকে। রেক্স যেন থমকে গেল। তার জ্বলন্ত চোখে একটা অবাক ভাব।

আমার ডান তর্জনী পিস্তলের ঘোড়া টিপে দিল।

বিস্ফোরণের সঙ্গো একটা চোখ ঝলসানো আলো, একটা ধোঁয়া আর চারিদিকে ছড়িয়ে পড়া বারুদের গন্ধ।

রেক্সের দেহের সামনের অংশ বারান্দার উপর ও পিছনটা ঘাসের উপর এলিয়ে পড়েছে।

পিস্তলের শব্দ শুনে কাক ডেকে উঠেছে দূরের গাছপালা থেকে। ফ্যাক্টরির দিক থেকে কিছু লোক যেন ছুটে আসছে বাংলোর দিকে।

ঘরে ফিরে এসে দরজায় হুড়কো লাগিয়ে খাটের উপর এসে বসলাম। বাইরে লোকের গোলমাল এগিয়ে আসছে।

পিস্তলের নলটা আমার কানের পাশে ঠেকাতে বুঝলাম সেটা বেশ গরম।

তারপর আর কিছু জানি না।

দরজা ধাক্কানিতে ঘুম ভেঙে গেল।

'চা লিয়ায়া বাবুজি!'

ঘরে দিনের আলো। চিরকালের অভ্যাসমতো দৃষ্টি আপনা থেকেই বাঁ হাতের কবজির দিকে চলে গেল।

ছ'টা বেজে তেরো মিনিট। ঘড়ি চোখের আরও কাছে আনলাম—কারণ তারিখটাও দেখা যায় এতে।

আটাশে এপ্রিল।

বাইরে থেকে সুখনরাম বলছে, 'আপকা গাড়ি ঠিক হো গিয়া বাবুজি।'

বীরভূমের নীলকর সাহেবের মৃত্যু শতবার্ষিকীতে আমার অভিজ্ঞতার কথা কি কেউ বিশ্বাস করবে? □

জয়ন্তর দিকে মিনিটখানেক তাকিয়ে থেকে তাকে প্রশ্নটা না করে পারলাম না। 'তোকে আজ যেন কেমন মনমরা মনে হচ্ছে? শরীর-টরীর খারাপ নয় তো?'

জয়ন্ত তার অন্যমনস্ক ভাবটা কাটিয়ে নিয়ে একটা ছেলেমানুষি হাসি হেসে বলল, 'নাঃ! শরীর তো খারাপ নয়ই, বরং অলরেডি অনেকটা তাজা লাগছে। জায়গাটা সত্যিই ভাল।'

'তোর তো চেনা জায়গা। আগে জানতিস না ভাল?'

'প্রায় ভুলে গেসলাম।' জয়ন্ত একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। 'অ্যাদ্দিন বাদে আবার ক্রমে ক্রমে মনে পড়ছে। বাংলোটা তো মনে হয় ঠিক আগের মতোই আছে। ঘরগুলোরও বিশেষ পরিবর্তন হয়নি। ফার্নিচারও কিছু কিছু সেই পুরনো আমলেরই রয়েছে বলে মনে হয়। যেমন এই বেতের টেবিল আর চেয়ারগুলো।'

বেয়ারা ট্রেতে করে চা আর বিস্কুট দিয়ে গেল। সবে চারটে বাজে, কিন্তু এর মধ্যেই রোদ পড়ে এসেছে। টি-পট থেকে চা ঢালতে-ঢালতে জিজ্ঞেস করলাম, 'কদ্দিন বাদে এলি?'

জয়ন্ত বলল, 'একত্রিশ বছর। তখন আমার বয়স ছিল ছয়।'

আমরা যেখানে বসে আছি সেটা বুন্দি শহরের সার্কিট হাউসের বাগান। আজ সকালেই এসে পৌঁছেছি। জয়ন্ত আমার ছেলেবেলার বন্ধু। আমরা এক স্কুলে ও এক কলেজে একসঙ্গে পড়েছি। এখন ও একটা খবরের কাগজের সম্পাদকীয় বিভাগে চাকরি করে, আর আমি করি ইস্কুল মাস্টারি। চাকরি জীবনে দু'জনের মধ্যে ব্যবধান এসে গেলেও বন্ধুত্ব টিকে আছে ঠিকই। রাজস্থান ভ্রমণের প্ল্যান আমাদের অনেকদিনের। দু'জনের একসঙ্গে ছুটি পেতে অসুবিধা হচ্ছিল, অ্যাদ্দিনে সেটা সম্ভব হয়েছে। সাধারণ লোকেরা রাজস্থান গেলে আগে জয়পুর-উদয়পুর-চিতোরটাই দেখে—কিন্তু জয়ন্ত প্রথম থেকেই বুন্দির উপর জোর দিচ্ছিল। আমিও আপত্তি করিনি, কারণ ছেলেবেলায় রবীন্দ্রনাথের কবিতায় 'বুঁদির কেল্লা' নামটার সঙ্গে পরিচয় ঘটেছিল, সে কেল্লা এতদিনে চাক্ষুষ দেখার সুযোগ হবে সেটা

ভাবতে মন্দ লাগছিল না। বুন্দি অনেকেই আসে না; তবে তার মানে এই নয় যে এখানে দেখার তেমন কিছুই নেই। ঐতিহাসিক ঘটনার দিক দিয়ে বিচার করলে উদয়পুর, যোধপুর, চিতোরের মূল্য হয়তো অনেক বেশি, কিন্তু সৌন্দর্যের বিচারে বুন্দি কিছু কম যায় না।

জয়ন্ত বুন্দি সম্পর্কে এত জোর দিয়ে বলতে প্রথমে একটু অদ্ভুত লেগেছিল; ট্রেনে আসতে-আসতে কারণটা জানতে পারলাম। সে ছেলেবেলায় একবার নাকি বুন্দিতে এসেছিল, তাই সেই পুরনো স্মৃতির সঙ্গে নতুন করে জায়গাটাকে মিলিয়ে দেখার একটা ইচ্ছে তার মনে অনেকদিন থেকেই ঘোরাফেরা করছে। জয়ন্তর বাবা অনিমেষ দাশগুপ্ত প্রত্নতাত্ত্বিক বিভাগে কাজ করতেন, তাই তাঁকে মাঝে মাঝে ঐতিহাসিক জায়গাগুলোতে ঘুরে বেড়াতে হত। এই সুযোগেই জয়ন্তর বুন্দি দেখা হয়ে যায়।

সার্কিট হাউসটা সত্যিই চমৎকার। ব্রিটিশ আমলের তৈরি, বয়স অন্তত শ'খানেক বছর তো বটেই। একতলা বাড়ি, টালি বসানো ঢালু ছাত, ঘরগুলো উঁচু উঁচু, উপর দিকে স্কাইলাইট দড়ি দিয়ে টেনে ইচ্ছেমতো খোলা বা বন্ধ করা যায়। পুব দিকে বারান্দা। তার সামনে প্রকাণ্ড কম্পাউন্ডে কেয়ারি করা বাগানে গোলাপ ফুটে রয়েছে। বাগানের পিছন দিকটায় নানারকম বড় বড় গাছে অজস্র পাখির জটলা। টিয়ার তো ছড়াছড়ি। ময়ূরের ডাকও মাঝে মাঝে শোনা যায়, তবে সেটা কম্পাউন্ডের বাইরে থেকে।

আমরা সকালে পৌঁছেই আগেই একবার শহরটা ঘুরে দেখে এসেছি। পাহাড়ের গায়ে বসানো বুন্দির বিখ্যাত কেল্লা। আজ দূর থেকে দেখেছি, কাল একেবারে ভিতরে গিয়ে দেখব। শহরে ইলেকট্রিক পোস্টগুলো না থাকলে মনে হত যেন আমরা সেই প্রাচীন রাজপুত আমলে চলে এসেছি। পাথর দিয়ে বাঁধানো রাস্তা, বাড়ির সামনের দিকে দোতলা থেকে ঝুলে পড়া অদ্ভুত সব কারুকার্য করা বারান্দা, কাঠের দরজাগুলোতে নিপুণ হাতের নকশা—দেখে মনেই হয় না যে আমরা যান্ত্রিক যুগে বাস করছি।

এখানে এসে অবধি লক্ষ করেছি জয়ন্ত সচরাচর যা বলে তার চেয়ে একটু কম কথা বলছে। হয়তো অনেক পুরনো স্মৃতি তার মনে ফিরে আসছে। ছেলেবেলার কোনও জায়গায় অনেকদিন পরে ফিরে এলে মনটা উদাস হয়ে যাওয়া আশ্চর্য নয়। আর জয়ন্ত যে সাধারণ লোকের চেয়ে একটু বেশি ভাবুক সেটা তো সকলেই জানে।

চায়ের পেয়ালা হাত থেকে নামিয়ে রেখে জয়ন্ত বলল,

'জানিস শঙ্কর, ব্যাপারটা ভারী অদ্ভুত। প্রথমবার যখন এখানে আসি, তখন মনে আছে এই চেয়ারগুলিতে আমি পা তুলে বাবু হয়ে বসতাম। মনে হত যেন একটা সিংহাসনে বসে আছি। এখন দেখছি চেয়ারগুলো আয়তনেও বড় না, দেখতেও অতি সাধারণ। সামনের যে ড্রয়িংরুম, সেটা এর দ্বিগুণ বড় বলে মনে হত। যদি এখানে ফিরে না আসতুম, তা হলে ছেলেবেলার ধারণাটাই কিন্তু টিকে যেত।'

আমি বললাম, 'এটাই তো স্বাভাবিক। ছেলেবেলায় আমরা থাকি ছোট; সেই অনুপাতে আশেপাশের জিনিসগুলোকে বড় মনে হয়। আমরা বয়সের সঙ্গে বাড়ি, কিন্তু জিনিসগুলো তো বাড়ে না!'

চা খাওয়া শেষ করে বাগানে ঘুরতে ঘুরতে জয়ন্ত হঠাৎ হাঁটা থামিয়ে বলে উঠল—'দেবদারু!'

কথাটা শুনে আমি একটু অবাক হয়ে তার দিকে চাইলাম। জয়ন্ত আবার বলল, 'একটা দেবদারু গাছ—ওই ওদিকটায় থাকার কথা।'

এই বলে সে দ্রুতবেগে গাছপালার মধ্যে দিয়ে কম্পাউন্ডের কোণের দিকে এগিয়ে গেল। হঠাৎ একটা দেবদারু গাছের কথা জয়ন্ত মনে রাখল কেন?

কয়েক সেকেন্ড পরেই জয়ন্তর উল্লসিত কণ্ঠস্বর পেলাম—'আছে! ইটস হিয়ার! ঠিক যেখানে ছিল সেখানেই—'

আমি এগিয়ে গিয়ে বললাম, 'গাছ যদি থেকে থাকে তো সে যেখানে ছিল সেখানেই থাকবে। গাছ তো আর হেঁটেচলে বেড়ায় না!'

জয়ন্ত একটু বিরক্তভাবে মাথা নেড়ে বলল, 'সেখানেই আছে মানে এই নয় যে আমি ভেবেছিলাম এই ত্রিশ বছরে গাছটা জায়গা পরিবর্তন করেছে। সেখানে মানে আমি যেখানে গাছটা ছিল বলে অনুমান করেছিলাম, সেইখানে।'

'কিন্তু একটা গাছের কথা হঠাৎ মনে পড়ল কেন তোর?'

জয়ন্ত ভ্রূকুঞ্চিত করে কিছুক্ষণ একদৃষ্টে গাছের গুঁড়ির দিকে চেয়ে ধীরে মাথা নেড়ে বলল, 'সেটা এখন আর কিছুতেই মনে পড়ছে না। কী একটা কারণে জানি গাছটার কাছে এসেছিলাম—কী একটা করেছিলাম। একটা সাহেব.....'

'সাহেব?'

'না, আর কিছু মনে পড়ছে না। মেমারির ব্যাপারটা সত্যিই ভারী অদ্ভুত.....'

এখানে বাবুর্চির রান্নার হাত ভাল। রাত্রে ডাইনিংরুমে ওভাল-শেপের টেবিলটায় বসে খেতে খেতে জয়ন্ত বলল, 'তখন যে বাবুর্চিটা ছিল, তার নাম ছিল দিল্‌ওয়ার। তার বাঁ গালে একটা কাটা দাগ ছিল, ছুরির দাগ—আর চোখ দুটো সবসময় জবাফুলের মতো লাল হয়ে থাকত। কিন্তু রান্না করত খাসা।'

খাবার পরে ড্রয়িংরুমের সোফাতে বসে জয়ন্তর ক্রমে আরও পুরনো কথা মনে

পড়তে লাগল। তার বাবা কোন সোফায় বসে চুরুট খেতেন, মা কোথায় বসে উল বুনতেন, টেবিলের ওপর কী কী ম্যাগাজিন পড়ে থাকত—সবই তার মনে পড়ল।

আর এইভাবেই শেষে তার পুতুলের কথাটাও মনে পড়ে গেল।

পুতুল বলতে মেয়েদের ডল পুতুল নয়। জয়ন্তর এক মামা সুইজারল্যান্ড থেকে এনে দিয়েছিলেন দশ-বারো ইঞ্চি লম্বা সুইসদেশীয় পোশাক পরা একটা বুড়োর মূর্তি। দেখতে নাকি একেবারে একটি খুদে জ্যান্ত মানুষ। ভিতরে যন্ত্রপাতি কিছু নেই, কিন্তু হাত পা আঙুল কোমর এমনভাবে তৈরি যে ইচ্ছামতো বাঁকানো যায়। মুখে একটা হাসি লেগেই আছে। মাথার উপর ছোট্ট হলদে পালক গোঁজা সুইস পাহাড়ি টুপি। এ ছাড়া পোশাকের খুঁটিনাটিতেও নাকি কোনওরকম ভুল নেই—বেল্ট বোতাম পকেট কলার মোজা—এমনকী জুতোর বকলসটা পর্যন্ত নিখুঁত।

প্রথমবার বুন্দিতে আসার কয়েকমাস আগেই জয়ন্তর মামা বিলেত থেকে ফেরেন, আর এসেই জয়ন্তকে পুতুলটা দেন? সুইজারল্যান্ডের কোনও গ্রামে এক বুড়োর কাছ থেকে পুতুলটা কেনেন তিনি। বুড়ো নাকি ঠাট্টা করে বলে দিয়েছিল, 'এর নাম ফ্রিৎস। এই নামে ডাকবে একে। অন্য নামে ডাকলে কিন্তু জবাব পাবে না।'

জয়ন্ত বলল, 'আমি ছেলেবেলায় খেলনা অনেক পেয়েছি। বাপ-মায়ের একমাত্র ছেলে ছিলাম বলেই বোধহয় তাঁরা এই ব্যাপারে আমাকে কখনও বঞ্চিত করেননি। কিন্তু মামার দেওয়া এই ফ্রিৎস-কে পেয়ে কী যে হল—আমি আমার অন্য সমস্ত খেলনার কথা একেবারে ভুলে গেলাম। রাতদিন ওকে নিয়েই পড়ে থাকতাম; এমনকী শেষে একটা সময় এল যখন আমি ফ্রিৎস-এর সঙ্গে ঘণ্টার পর ঘণ্টা দিব্যি আলাপ চালিয়ে যেতাম। এক তরফা আলাপ অবিশ্যি, কিন্তু ফ্রিৎস-এর মুখে এমন একটা হাসি, আর ওর চোখে এমন একটা চাহনি ছিল যে, মনে হত যেন আমার কথা ও বেশ বুঝতে পারছে। এক-এক সময় এমনও মনে হত যে, আমি যদি বাংলা না বলে জার্মান বলতে পারতাম, তা হলে আমাদের আলাপটা হয়তো একতরফা না হয়ে দু'তরফা হত। এখন ভাবলে ছেলেমানুষি পাগলামি মনে হয়, কিন্তু তখন আমার কাছে ব্যাপারটা ছিল ভীষণ 'রিয়েল'। বাবা-মা বারণ করতেন অনেক, কিন্তু আমি কারুর কথা শুনতাম না। তখন আমি ইস্কুল যেতে শুরু করিনি, কাজেই ফ্রিৎসকে দেবার জন্য সময়ের অভাব ছিল না আমার।'

এই পর্যন্ত বলে জয়ন্ত চুপ করল। ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখি রাত সাড়ে ন'টা। বুন্দি শহর নিস্তব্ধ হয়ে গেছে। আমরা সার্কিট হাউসের বৈঠকখানায় একটা ল্যাম্প জ্বালিয়ে বসে আছি।

আমি বললাম, 'পুতুলটা কোথায় গেল?'

জয়ন্ত এখনও যেন কী ভাবছে। উত্তরটা এত দেরিতে এল যে, আমার মনে হচ্ছিল প্রশ্নটা বুঝি ওর কানেই যায়নি।

'পুতুলটা বুন্দিতে নিয়ে এসেছিলাম। এখানে নষ্ট হয়ে যায়।'

'নষ্ট হয়ে যায়?' আমি প্রশ্ন করলাম। 'কীভাবে?'

জয়ন্ত একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'একদিন বাইরে বাগানে বসে চা খাচ্ছিলাম আমরা। পুতুলটাকে পাশে ঘাসের ওপর রেখেছিলাম। কাছে কতগুলো কুকুর জটলা করছিল। তখন আমার যা বয়স, তাতে চা খাবার কথা নয়, কিন্তু জেদ করে চা

নিয়ে খেতে খেতে হঠাৎ পেয়ালাটা কাত হয়ে খানিকটা গরম চা আমার প্যান্টে পড়ে যায়। বাংলোয় এসে প্যান্ট বদল করে বাইরে ফিরে গিয়ে দেখি পুতুলটা নেই। খোঁজাখুঁজির পর দেখি আমার ফ্রিৎসকে নিয়ে দুটো রাস্তার কুকুর দিব্যি টাগ-অফ-ওয়ার খেলছে। জিনিসটা খুবই মজবুত ছিল তাই ছিঁড়ে আলগা হয়ে যায়নি। তবে চোখমুখ ক্ষতবিক্ষত হয়ে জামাকাপড় ছিঁড়ে গিয়েছিল। অথাৎ, আমার কাছে ফ্রিৎস-এর আর অস্তিত্বই ছিল না। হি ওয়াজ ডেড।'

'তারপর?' ভারী আশ্চর্য লাগছিল জয়ন্তর এই কাহিনী।

'তারপর আর কী? যথাবিধি ফ্রিৎস-এর সৎকার করি!'

'তার মানে?'

'ওই দেবদারু গাছটার নিচে ওকে কবর দিই। ইচ্ছে ছিল কফিন জাতীয় একটা কিছু জোগাড় করা—সাহেব তো! একটা বাক্স থাকলেও কাজ চলত, কিন্তু অনেক খোঁজাখুঁজি করেও কিছুই পেলাম না। তাই শেষটায় এমনিই পুঁতে ফেলি।'

এতক্ষণে দেবদারু গাছের রহস্য আমার কাছে পরিষ্কার হল।

দশটা নাগাদ ঘুমোতে চলে গেলাম।

একটা বেশ বড় বেডরুমে দুটো আলাদা খাটে আমাদের বিছানা। কলকাতায় হাঁটার অভ্যেস নেই, এমনিতেই বেশ ক্লান্ত লাগছিল, তার উপর বিছানায় ডানলোপিলো। বালিশে মাথা দেবার দশ মিনিটের মধ্যেই ঘুম এসে গেল।

রাত তখন ক'টা জানি না, একটা কীসের শব্দে জানি ঘুমটা ভেঙে গেল। পাশ ফিরে দেখি জয়ন্ত সোজা হয়ে বিছানার উপর বসে আছে। তার পাশের টেবিল ল্যাম্পটা জ্বলছে, আর সেই আলোয় তার চাহনিতে উদ্বেগের ভাবটা স্পষ্ট ধরা পড়ছে। জিজ্ঞেস করলাম, 'কী হল? শরীর খারাপ লাগছে নাকি?'

জয়ন্ত জবাব না দিয়ে আমাকে একটা পালটা প্রশ্ন করল—'সার্কিট হাউসে বেড়াল বা ইঁদুর জাতীয় কিছু আছে নাকি?'

বললাম, 'থাকাটা কিছুই আশ্চর্য না। কিন্তু কেন বল তো?

'বুকের উপর দিয়ে কী যেন একটা হেঁটে গেল। তাই ঘুমটা ভেঙে গেল।'

আমি বললাম, 'ইঁদুর জিনিসটা সচরাচর নর্মদা-টর্দমা দিয়ে ঢোকে। আর খাটের উপর ইঁদুর ওঠে বলে তো জানা ছিল না।'

জয়ন্ত বলল, 'এর আগেও একবার ঘুমটা ভেঙেছিল, তখন জানলার দিক থেকে একটা খচখচ শব্দ পাচ্ছিলাম।'

'জানলায় যদি আওয়াজ পেয়ে থাকিস তা হলে বেড়ালের সম্ভাবনাটাই বেশি।'

'কিন্তু তা হলে.....'

জয়ন্তর মন থেকে যেন খটকা যাচ্ছে না। বললাম, 'বাতিটা জ্বালার পর কিছু দেখতে পাসনি?'

'নাথিং। অবিশ্যি ঘুম ভাঙার সঙ্গে-সঙ্গেই বাতিটা জ্বালিনি। প্রথমটা বেশ হকচকিয়ে গেসলাম। সত্যি বলতে কি, একটু ভয়ই করছিল। আলো জ্বালার পর কিছুই দেখতে পাইনি।'

'তার মানে যদি কিছু এসে থাকে তা হলে সেটা ঘরের মধ্যেই আছে?'

'তা...দরজা যখন দুটোই বন্ধ...'

আমি চট করে বিছানা ছেড়ে উঠে ঘরের আনাচে-কানাচে, খাটের তলায়, সুটকেসের পিছনে একবার খুঁজে দেখে নিলাম। কোথাও কিচ্ছু নেই। বাথরুমের দরজাটা ভেজানো ছিল; সেটার ভিতরেও খুঁজতে গেছি, এমন সময় জয়ন্ত চাপা গলায় ডাক দিল।

'শঙ্কর!'

ফিরে এলাম ঘরে। জয়ন্ত দেখি তার লেপের সাদা ওয়াড়টার দিকে চেয়ে আছে। আমি তার দিকে এগিয়ে যেতে সে লেপের একটা অংশ ল্যাম্পের দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, 'এটা কী দ্যাখ তো।'

কাপড়টার উপর ঝুঁকে পড়ে দেখি তাতে হালকা খয়েরি রঙের ছোট ছোট গোল গোল কীসের জানি ছাপ পড়েছে। বললাম, 'বিড়ালের থাবা হলেও হতে পারে।'

জয়ন্ত কিছু বলল না। বেশ বুঝতে পারলাম কী কারণে জানি সে ভারী চিন্তিত হয়ে পড়েছে। এদিকে রাত আড়াইটে বাজে। এত কম ঘুমে আমার ক্লান্তি দূর হবে না, তা ছাড়া কালকেও সারাদিন ঘোরাঘুরি আছে। তাই, আমি পাশে আছি, কোনও ভয় নেই, ছাপগুলো আগে থেকেই থাকতে পারে, ইত্যাদি বলে কোনওরকমে তাকে আশ্বাস দিয়ে বাতি নিভিয়ে আবার শুয়ে পড়লাম। আমার কোনও সন্দেহ ছিল না যে, জয়ন্ত যে অভিজ্ঞতার কথাটা বলল সেটা আসলে তার স্বপ্নের অন্তর্গত। বুন্দিতে এসে পুরনো কথা মনে পড়ে ও একটা মানসিক উদ্বেগের মধ্যে রয়েছে, আর তার থেকেই বুকে বেড়াল হাঁটার স্বপ্নের উদ্ভব হয়েছে।

রাত্রে আর কোনও ঘটনা ঘটে থাকলেও আমি সে বিষয়ে কিছু জানতে পারিনি, আর জয়ন্তও সকালে উঠে নতুন কোনও অভিজ্ঞতার কথা বলেনি। তবে তাকে দেখে এটুকু বেশ বুঝতে পারলাম যে, রাত্রে তার ভাল ঘুম হয়নি। মনে মনে স্থির করলাম যে, আমার কাছে যে ঘুমের বড়িটা আছে, আজ রাত্রে শোয়ার আগে তার একটা জয়ন্তকে খাইয়ে দেব।

আমার প্ল্যান অনুযায়ী আমরা ব্রেকফাস্ট সেরে ন'টার

সময় বুন্দির কেল্লা দেখতে গেলাম। গাড়ির ব্যবস্থা করা ছিল আগে থেকেই। কেল্লায় পৌঁছতে-পৌঁছতে হয়ে গেল প্রায় সাড়ে ন'টা।

এখানে এসেও দেখি জয়ন্তর সব ছেলেবেলার কথা মনে পড়ে যাচ্ছে। তবে সৌভাগ্যক্রমে তার সঙ্গে তার পুতুলের কোনও সম্পর্ক নেই। সত্যি বলতে কি, জয়ন্তর ছেলেমানুষি উল্লাস দেখে মনে হচ্ছিল সে বোধহয় পুতুলের কথাটা ভুলে গেছে। একেকটা জিনিস দেখে আর চেঁচিয়ে-চেঁচিয়ে ওঠে—'ওই যে গেটের মাথায় সেই হাতি! ওই যে সেই গম্বুজ! এই সেই রূপোর খাট আর সিংহাসন! ওই যে দেয়ালে আঁকা ছবি!.....'

কিন্তু ঘণ্টাখানেক যেতে না যেতেই তার ফুর্তি কমে এল। আমি নিজে এত তন্ময় ছিলাম যে, প্রথমে সেটা বুঝতে পারিনি। একটা লম্বা ঘরের ভিতর দিয়ে হাঁটছি আর সিলিং-এর দিকে চেয়ে ঝাড় লণ্ঠনগুলো দেখছি, এমন সময় হঠাৎ খেয়াল হল জয়ন্ত আমার পাশে নেই। কোথায় পালাল সে?

আমাদের সঙ্গে একজন গাইড ছিল, সে বলল বাবু বাইরে ছাতের দিকটায় গেছে।

দরবার ঘর থেকে বেরিয়ে এসেই দেখি জয়ন্ত বেশ খানিকটা দূরে ছাদের উলটো দিকের পাঁচিলের পাশে অন্যমনস্কভাবে দাঁড়িয়ে আছে। সে আপন চিন্তায় এমনই মগ্ন যে, আমি পাশে গিয়ে দাঁড়াতেও তার অবস্থার কোনও পরিবর্তন হল না। শেষটায় আমি নাম ধরে ডাকতে সে চমকে উঠল। বললাম, 'কী হয়েছে তোর ঠিক করে বল তো। এমন চমৎকার জায়গায় এসেও তুই মুখ ব্যাজার করে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকবি—এ আমার বরদাস্ত হচ্ছে না।'

জয়ন্ত শুধু বলল, 'তোর দেখা শেষ হয়েছে কি? তা হলে এবার.....'

আমি একা হলে নিশ্চয়ই আরও কিছুক্ষণ থাকতাম, কিন্তু জয়ন্তর ভাবগতিক দেখে সার্কিট হাউসে ফিরে যাওয়াই স্থির করলাম।

পাহাড়ের গা দিয়ে বাঁধানো রাস্তা শহরের দিকে গিয়েছে। আমরা দু'জনে চুপচাপ গাড়ির পিছনে বসে আছি। জয়ন্তকে সিগারেট অফার করতে সে নিল না। তার মধ্যে একটা চাপা উত্তেজনার ভাব লক্ষ্য করলাম, যেটা প্রকাশ পাচ্ছিল তার হাত দুটোর অস্থিরতায়। হাত একবার গাড়ির জানলায় রাখছে, একবার কোলের ওপর, পরক্ষণেই আবার আঙুল মটকাচ্ছে, না হয় নখ কামড়াচ্ছে। জয়ন্ত এমনিতে শান্ত মানুষ। তাকে এভাবে ছটফট করতে দেখে আমার ভারী অসোয়াস্তি লাগছিল।

মিনিট দশেক এইভাবে চলার পর আমি আর থাকতে পারলাম না। বললাম, 'তোর দুশ্চিন্তার কারণটা আমায় বললে হয়তো তোর কিছুটা উপকার হতে পারে।'

জয়ন্ত মাথা নেড়ে বলল, 'বলে লাভ নেই, কারণ বললে তুই বিশ্বাস করবি না।'

'বিশ্বাস না করলেও, বিষয়টা নিয়ে অন্তত তোর সঙ্গে আলোচনা করতে পারব।'

'কাল রাত্রে ফ্রিৎস আমাদের ঘরে এসেছিল। লেপের ওপর ছাপগুলো সব ফ্রিৎসের পায়ের ছাপ।'

এ-কথার পর অবিশ্যি জয়ন্তর কাঁধ ধরে দুটো ঝাঁকুনি দেওয়া ছাড়া আমার আর কিছু করার থাকে না। যার মাথায় এমন একটা প্রচণ্ড আজগুবি ধারণা আশ্রয় নিয়েছে, তাকে কি কিছু বলে বোঝানো যায়? তবু বললাম, 'তুই নিজের চোখে তো দেখিসনি কিছুই।'

'না—তবে বুকের উপর যে জিনিসটা হাঁটছে সেটা যে চারপেয়ে নয়, দু'পেয়ে, সেটা বেশ বুঝতে পারছিলাম।'

সার্কিট হাউসে এসে গাড়ি থেকে নামার সময় মনে মনে স্থির করলাম জয়ন্তকে একটা নার্ভ টনিক গোছের কিছু দিতে হবে। শুধু ঘুমের বড়িতে হবে না। ছেলেবেলার সামান্য একটা স্মৃতি একটা সাঁইত্রিশ বছরের জোয়ান মানুষকে এত উদ্ব্যস্ত করে তুলবে—এ কিছুতেই হতে দেওয়া চলে না।

ঘরে এসে জয়ন্তকে বললাম, 'বারোটা বাজে, স্নানটা সেরে ফেললে হত না!'

জয়ন্ত 'তুই আগে যা' বলে খাটে গিয়ে শুয়ে পড়ল।

স্নান করতে করতে আমার মাথায় ফন্দি এল। জয়ন্তকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনার বোধহয় এই একমাত্র রাস্তা।

ফন্দিটা এই—ত্রিশ বছর আগে যদি পুতুলটাকে একটা বিশেষ জায়গায় মাটির তলায় পুঁতে রাখা হয়ে থাকে, আর সেই জায়গাটা কোথায় যদি জানা থাকে, তা হলে সেখানে মাটি খুঁড়লে আস্ত পুতুলটাকে আগের অবস্থায় না পেলেও, তার কিছু অংশ এখনও নিশ্চয়ই পাবার সম্ভাবনা আছে। কাপড় জামা মাটির তলায় ত্রিশ বছর থেকে যেতে পারে না; কিন্তু ধাতব জিনিস—যেমন ফ্রিৎসের বেল্টের বকলস বা কোটের পেতলের বোতাম—এসব জিনিসগুলো টিকে থাকা কিছুই আশ্চর্য নয়। জয়ন্তকে যদি দেখানো যায় যে তার সাধের পুতুলের শুধু ওই জিনিসগুলোই অবশিষ্ট আছে, আর সব মাটির সঙ্গে মিশে গেছে, তা হলে হয়তো তার মন থেকে উদ্ভট ধারণা দূর হবে। এ না করলে প্রতিরাত্রেই সে আজগুবি স্বপ্ন দেখবে, আর সকালে উঠে বলবে ফ্রিৎস আমার বুকের উপর হাঁটাহাঁটি করছিল। এইভাবে ক্রমে তার মাথাটা বিগড়ে যাওয়া অসম্ভব না।

জয়ন্তকে ব্যাপারটা বলাতে তার ভাব দেখে মনে হল ফন্দিটা তার মনে ধরেছে। কিছুক্ষণ চুপচাপ থেকে সে বলল, 'খুঁড়বে কে? কোদাল কোথায় পাবে?'

আমি হেসে বললাম, 'এতবড় বাগান যখন রয়েছে তখন মালিও একটা নিশ্চয়ই আছে। আর মালি থাকা মানেই কোদালও আছে। লোকটাকে কিছু বকশিস দিলে সে

মাঠের এক প্রান্তে একটা গাছের গুঁড়ির পাশে খানিকটা মাটি খুঁড়ে দেবে না—এটা বিশ্বাস করা কঠিন।'

জয়ন্ত তৎক্ষণাৎ রাজি হল না। আমিও আর কিছু বললাম না। আরও দু-একবার হুমকি দেবার পর সে স্নানটা সেরে এল। এমনিতে খাইয়ে লোক হলেও, দুপুরে সে মাত্র দু'খানা হাতের রুটি আর সামান্য মাংসের কারি ছাড়া আর কিছুই খেল না। খাওয়া সেরে বাগানের দিকের বারান্দায় গিয়ে বেতের চেয়ারে বসে রইলাম দু'জনে। আমরা ছাড়া সার্কিট হাউসে কেউ নেই। দুপুরটা থমথমে। ডানদিকে নুড়ি ফেলা রাস্তার ওপাশে একটা কৃষ্ণচূড়া গাছে কয়েকটা হনুমান বসে আছে, মাঝে মাঝে তাদের হুপ্ হুপ্ ডাক শোনা যাচ্ছে।

তিনটে নাগাদ একটা পাগড়ি পরা লোক হাতে একটা ঝারি নিয়ে বাগানে এল। লোকটার বয়স হয়েছে। চুল গোঁফ গালপাট্টা সবই ধবধবে সাদা।

'তুমি বলবে, না আমি?'

জয়ন্তর প্রশ্নতে আমি তার দিকে আশ্বাসের ভঙ্গিতে একটা হাত তুলে ইশারা করে চেয়ার ছেড়ে উঠে সোজা চলে গেলাম মালিটার দিকে।

মাটি খোঁড়ার প্রস্তাবে মালি প্রথমে কেমন জানি অবাক সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাল। বোঝা গেল এমন প্রস্তাব তাকে এর আগে কেউ কোনওদিন করেনি। তার 'কাহে বাবু?' প্রশ্নতে আমি তার কাঁধে হাত রেখে নরম গলায় বললাম, 'কারণটা না হয় নাই জানলে। পাঁচ টাকা বকশিস দেব—যা বলছি করে দাও।'

বলা বাহুল্য, মালি তাতে শুধু রাজিই হল না, দন্ত বিকশিত করে সেলাম-টেলাম ঠুকে এমন ভাব দেখাল যেন সে আমাদের চিরকালের কেনা গোলাম।

বারান্দায় বসা জয়ন্তকে হাতছানি দিয়ে ডাকলাম। সে চেয়ার ছেড়ে আমার দিকে এগিয়ে এল। কাছে এলে বুঝলাম তার মুখ অস্বাভাবিক রকম ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। আশা করি খোঁড়ার ফলে পুতুলের কিছুটা অংশ অন্তত পাওয়া যাবে।

মালি ইতিমধ্যে কোদাল নিয়ে এসেছে। আমরা তিনজনে দেবদারু গাছটার দিকে এগোলাম।

গাছের গুঁড়িটার থেকে হাত দেড়েক দূরে একটা জায়গার দিকে হাত দেখিয়ে জয়ন্ত বলল, 'এইখানে।'

'ঠিক মনে আছে তো তোর?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

জয়ন্ত মুখে কিছু না বলে কেবল মাথাটা একবার নাড়িয়ে হ্যাঁ বুঝিয়ে দিল।

'কতটা নিচে পুঁতেছিলি?'

'এক বিঘত তো হবেই?'

মালি আর দ্বিরুক্তি না করে মাটিতে কোপ দিতে শুরু করল। লোকটার রসবোধ আছে। খুঁড়তে খুঁড়তে একবার জিজ্ঞেস করল মাটির নিচে ধনদৌলত আছে কিনা, এবং যদি থাকে তা হলে তার থেকে তাকে ভাগ দেওয়া হবে কিনা। এ-কথা শুনে আমি হাসলেও, জয়ন্তর মুখে কোনও হাসির আভাস দেখা গেল না। অক্টোবর মাসে বুন্দিতে গরম নেই, কিন্তু কলারের নিচে জয়ন্তর শার্ট ভিজে গেছে। সে একদৃষ্টে মাটির দিকে চেয়ে রয়েছে। মালি কোদালের কোপ মেরে চলেছে। এখনও পুতুলের কোনও চিহ্ন দেখা যাচ্ছে না কেন?

একটা ময়ূরের তীক্ষ্ণ ডাক শুনে আমি মাথাটা একবার ঘুরিয়েছি, এমন সময় জয়ন্তর গলা দিয়ে একটা অদ্ভুত আওয়াজ পেয়ে আমার চোখটা তৎক্ষণাৎ তার দিকে চলে গেল। তার নিজের চোখ যেন ঠিকরে বেরিয়ে আসছে। পরক্ষণেই তার কম্পমান ডান হাতটা সে ধীরে ধীরে বাড়িয়ে দিয়ে তর্জনীটাকে সোজা করে গর্তটার দিকে নির্দেশ করল। আঙুলটাকেও স্থির রাখতে পারছে না সে।

তারপর এক অস্বাভাবিক শুকনো ভয়ার্ত স্বরে প্রশ্ন এল—

'ওটা কী!'

মালির হাত থেকে কোদালটা মাটিতে পড়ে গেল।

মাটির দিকে চেয়ে যা দেখলাম তাতে ভয়ে, বিস্ময়ে ও অবিশ্বাসে আপনা থেকেই আমার মুখ হাঁ হয়ে গেল।

দেখলাম, গর্তের মধ্যে ধুলোমাখা অবস্থায় চিত হয়ে হাত-পা ছড়িয়ে পড়ে আছে একটি দশ-বারো ইঞ্চি ধবধবে সাদা নিখুঁত নরকঙ্কাল! □'

রেডিন সাহেবের বাড়ি

ব্রাউন সাহেবের ডায়রিটি হাতে আসার পর থেকেই ব্যাঙ্গালোর যাবার একটা সুযোগ খুঁজছিলাম। সেটা এল বেশ অপ্রত্যাশিত ভাবে। আমাদের বালিগঞ্জ স্কুলের বাৎসরিক রি-ইউনিয়নে দেখা হয়ে গেল আমার পুরনো সহপাঠী অনীকেন্দ্র ভৌমিকের সঙ্গে। অনীক বলল সে ব্যাঙ্গালোরে ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্সে চাকরি করছে। 'একবার ঘুরে যা না এসে আমার ওখানে। দ্য বেস্ট প্লেস ইন ইন্ডিয়া! একটা বাড়তি ঘরও আছে আমার বাড়িতে। আসবি?'

অনীক স্কুলে থাকতে আমার খুবই বন্ধু ছিল। তারপর যা হয় আর কি। কলেজ হয়ে গেল দু'জনের আলাদা। তা ছাড়া ও বিজ্ঞান আর আমি আর্টস। দু'জনে প্রায় উলটোমুখো রাস্তা ধরে চলতে আরম্ভ করলাম। মাঝে ও আবার চলে গেল বিলেতে। ফলে ক্রমে দু'জনের বন্ধুত্বের মধ্যেও অনেকটা ব্যবধান এসে পড়ল। আর আজ প্রায় বারো বছর পর তার সঙ্গে দেখা। বললাম, 'গিয়ে পড়তে পারি। কোন সময়টা ভাল?'

'এনি টাইম। ব্যাঙ্গালোরে গরম নেই। সাধে কি জায়গাটা সাহেবদের এত প্রিয়? তুই যখনই আসতে চাস আসিস। তবে সাতদিনের নোটিশ পেলে ভাল হয়।'

যাক, তা হলে ব্রাউন সাহেবের বাড়িটা দেখার সৌভাগ্য হলেও হতে পারে। কিন্তু তার আগে সাহেবের ডায়রিটার কথা বলা দরকার।

আমি হলাম যাকে বলে পুরনো বইয়ের পোকা। ব্যাঙ্কে কাজ করে প্রতি মাসে যা রোজগার হয়, তার অন্তত অর্ধেক টাকা পুরনো বই কেনার পিছনে খরচ হয়। ভ্রমণ-কাহিনী, শিকারের গল্প, ইতিহাস, আত্মজীবনী, ডায়রি—কতরকম বই না গত পাঁচ বছরে জমে উঠেছে আমার। পোকায় কাটা পাতা, বার্ধক্যে ঝুরঝুরে হয়ে যাওয়া পাতা, ড্যাম্পে বিবর্ণ হওয়া পাতা—এসবই আমার কাছে অতি পরিচিত এবং অতি প্রিয় জিনিস। আর পুরনো বইয়ের গন্ধ—এর জুড়ি নেই। অগুরু কস্তুরী গোলাপ হাসনুহানা—মায় ফরাসি সেরা পারফিউমের সুবাস এই দুটো গন্ধর কাছে হার মেনে যায়।

এই পুরনো বই কেনাই আমার একমাত্র নেশা, আর পুরনো বই কিনতে গিয়েই পাওয়া ব্রাউন সাহেবের ডায়রিটা। বলে রাখি এ ডায়রি কিন্তু ছাপা ডায়রি নয়—যদিও সেরকম ডায়রিও আমার আছে। এ ডায়রি একেবারে খাগের কলমে লেখা আসল

ডায়রি। লাল চামড়ায় বাঁধানো সাড়ে তিনশো পাতার রুলটানা খাতা। ছ'ইঞ্চি বাই সাড়ে চার ইঞ্চি। মলাটের চারপাশে সোনার জলের নকশা করা বর্ডার, তার মাঝখানে সোনার ছাপার অক্ষরে লেখা সাহেবের নাম—জন মিডলটন ব্রাউন। মলাট খুললে প্রথম পাতায় সাহেবের নিজের হাতে নাম সই, তার নীচে সাহেবের ঠিকানা—এভারগ্রিন লজ, ফ্রেজার টাউন, ব্যাঙ্গালোর—আর তার নীচে লেখা—জানুয়ারি, ১৮৫৮। অর্থাৎ এ ডায়রির বয়স হল একশো তেরো। এই ব্রাউন সাহেবের নাম লেখা অন্য আরও খানকতক বইয়ের সঙ্গে ছিল এই লাল চামড়ায় বাঁধানো খাতাটা। নামকরা বইয়ের তুলনায় দাম খুবই কম। মকবুল চাইল কুড়ি, আমি বললাম দশ, শেষটায় বারো টাকার বিনিময়ে বইটা আমার সম্পত্তি হয়ে গেল। ব্রাউন যদি নামকরা কেউ হতেন তা হলে এই বইয়ের দাম হাজার টাকা হতে পারত।

ডায়রিটাতে তখনকার দিনের ভারতবর্ষে সাহেবদের দৈনন্দিন জীবনের বাইরে আর কিছু জানতে পাব এমন আশা করিনি। সত্যি বলতে কি, প্রথম শ'খানেক পাতা পড়ে তার বেশি পাইওনি। ব্রাউন সাহেবের পেশা ছিল ইস্কুলমাস্টারি। ব্যাঙ্গালোরের কোনও একটা স্কুলে শিক্ষকতা করতেন। সাহেব নিজের কথাই বেশি বলেছেন; মাঝে মাঝে ব্যাঙ্গালোর শহরের বর্ণনা করেছেন। এক জায়গায় তখনকার বড়লাটের গিন্নি লেডি ক্যানিং-এর ব্যাঙ্গালোর আসার ঘটনা বলেছেন, ব্যাঙ্গালোরের ফুল ফল গাছপালা ও তাঁর নিজের বাগানের কথা বলেছেন। এক এক জায়গায় আবার ইংল্যান্ডের সাসেক্স অঞ্চলে তাঁর পৈতৃক বাড়ি, আর তাঁর পিছনে-ফেলে আসা আত্মীয়স্বজনের কথা বলেছেন। তাঁর স্ত্রী এলিজাবেথের উল্লেখও আছে, তবে স্ত্রীটি কয়েক বছর আগেই মারা গিয়েছিলেন।

সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং ব্যাপার হচ্ছে সাইমন নামে কোনও এক ব্যক্তির বারংবার উল্লেখ। এই সাইমন যে কে ছিলেন—তাঁর ছেলে না ভাই না ভাগ্নে না বন্ধু না কী—সেটা বোঝার কোনও উপায় ডায়রিতে নেই। তবে সাইমনের প্রতি ব্রাউন সাহেবের যে একটা গভীর টান ছিল সেটা বুঝতে কোনও অসুবিধা হয় না। সাইমনের বুদ্ধি, সাইমনের সাহস, সাইমনের রাগ অভিমান দুষ্টুমি খামখেয়ালিপনা ইত্যাদির কথা বারবার আছে ডায়রিতে। সাইমন অমুক চেয়ারটায় বসতে ভালবাসে, আজ সাইমনের শরীরটা ভাল নেই, সাইমনকে আজ সারাদিন দেখতে পাইনি বলে মনখারাপ—এই ধরনের সব খুঁটিনাটি খবরও আছে। আর আছে সাইমনের মর্মান্তিক মৃত্যুর খবর। ২২শে সেপ্টেম্বর সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা নাগাদ বজ্রাঘাতে সাইমনের মৃত্যু হয়। পরের দিন ভোরবেলা ব্রাউন সাহেবের বাগানে একটা বাজে ঝলসে যাওয়া ইউক্যালিপটাস গাছের পাশে সাইমনের মৃতদেহ পাওয়া যায়।

এর পর থেকে একটা মাস ডায়রিতে প্রায় আর কিছুই লেখা হয়নি। যেটুকু হয়েছে তার মধ্যে শোক আর হতাশার কথা ছাড়া আর কিছু নেই। ব্রাউন সাহেব

দেশে ফিরে যাবার কথা ভাবছেন—কিন্তু সাইমনের আত্মা থেকে দূরে সরে যেতে তাঁর মন চায়নি। সাহেবের স্বাস্থ্যও যেন অল্প অল্প ভেঙে পড়েছে। 'আজও স্কুলে গেলাম না' কথাটা পাঁচ জায়গায় বলা হয়েছে। লুকাস বলে একজন ডাক্তারের উল্লেখও আছে। তিনি ব্রাউন সাহেবকে পরীক্ষা করে ওষুধ বাতলে গেছেন।

তারপর হঠাৎ—২রা নভেম্বর—ডায়রিতে এক আশ্চর্য ঘটনার উল্লেখ; এবং এই ঘটনাই আমার কাছে ডায়রির মূল্য হাজার গুণ বাড়িয়ে দিয়েছে। ব্রাউন সাহেব এ ঘটনাটা লিখেছেন রোজকার নীলের বদলে লাল কালিতে। তাতে বলছেন (আমি বাংলায় অনুবাদ করছি)—'আজ এক অভাবনীয় আশ্চর্য ঘটনা! আমি বিকালে লালবাগে গিয়েছিলাম গাছপালার সান্নিধ্যে আমার মনটাকে একটু শান্ত করার জন্য। সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা নাগাদ বাড়ি ফিরে বৈঠকখানায় ঢুকেই দেখি—সাইমন ফায়ারপ্লেসের পাশে তার প্রিয় হাই-ব্যাকড চেয়ারটিতে বসে আছে। সাইমন! সত্যিই সাইমন! আমি তো দেখে আনন্দে আত্মহারা। আর শুধু যে বসে আছে তা নয়—সে একদৃষ্টে আমারই দিকে তাকিয়ে আছে তার স্নেহমাখানো চোখ দুটি দিয়ে। এদিকে ঘরে বাতি নেই। আমার ফাঁকিবাজ খানসামা টমাস এখনও ল্যাম্প জ্বালেনি। তাই সাইমনকে আরেকটু ভাল করে দেখব বলে আমি পকেট থেকে দেশলাইটা বার করলাম। কাঠি বার করে বাক্সের গায়ে ঘষতেই আলো জ্বলে উঠল—কিন্তু কী আফসোস! এই কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই সাইমন উধাও! অবিশ্যি সাইমনকে যে কোনওদিন আবার দেখতে পাব সেটাই তো আশা করিনি! এইভাবে ভূত অবস্থাতেও যদি মাঝে মাঝে সে দেখা দিয়ে যায়, তা হলে আমার মন থেকে সব দুঃখ দূর হয়ে যাবে। সত্যি আজ এক অপূর্ব আনন্দের দিন। সাইমন মরে গিয়েও আমাকে ভোলেনি; এমনকী তার প্রিয় চেয়ারটিকেও সে ভোলেনি। দোহাই সাইমন—মাঝে মাঝে দেখা দিও—আর কিছু চাই না আমি তোমার কাছে। এইটুকু পেলেই আমি বাকি জীবনটা শান্তিতে কাটাতে পারব।'

এর পরে ডায়রি আর বেশিদিন চলেনি। যেটুকু আছে তার মধ্যে কোনও দুঃখের ছাপ নেই, কারণ সাইমনের সঙ্গে ব্রাউন সাহেবের প্রতিদিনই একবার করে দেখা হয়েছে। সাইমনের ভূত সাহেবকে হতাশ করেনি।

ডায়রির শেষ পাতায় লেখা আছে—'যে আমাকে ভালবাসে, তার মৃত্যুর পরেও যে তার সে-ভালবাসা অটুট থাকে, এই জ্ঞান লাভ করে আমি পরম শান্তি পেয়েছি।'

ব্যস্—এই শেষ। কিন্তু এখন কথা হচ্ছে—ব্রাউন সাহেবের এই বাড়ি—ব্যাঙ্গালোরের ফ্রেজার টাউনের এভারগ্রিন লজ—এখনও আছে কি? আর সেখানে এখনও সন্ধ্যাকালে সাইমন সাহেবের ভূতের আগমন হয় কি? আর সে ভূত কি অচেনা লোককে দেখা দেয়? আমি যদি সে-বাড়িতে গিয়ে একটা সন্ধ্যা কাটাই—তা হলে সাইমনের ভূতকে দেখতে পাব কি?

ব্যাঙ্গালোরে এসে প্রথম দিন অনীককে এসব কিছুই বলিনি। সে আমাকে তার অ্যাম্বাসাডর গাড়িতে করে সমস্ত ব্যাঙ্গালোর শহর ঘুরিয়ে দেখিয়েছে—এমনকী ফ্রেজার টাউনও। ব্যাঙ্গালোর সত্যিই সুন্দর জায়গা, তাই শহরটা সম্বন্ধে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করতে আমার কোনও মিথ্যার আশ্রয় নিতে হয়নি। শুধু সুন্দর নয়—কলকাতার পর এমন একটা শান্ত কোলাহলশূন্য শহরকে প্রায় একটা অবাস্তব স্বপ্নরাজ্যের মতো মনে হয়।

দ্বিতীয় দিন ছিল রবিবার। সকালে অনীকের বাগানে রঙিন ছাতার তলায় বসে চা খেতে খেতে প্রথম ব্রাউন সাহেবের প্রসঙ্গটা তুললাম। ও শুনেটুনে হাত থেকে চায়ের পেয়ালা নামিয়ে বেতের টেবিলের উপর রেখে বলল, 'দ্যাখ রঞ্জন—যে বাড়ির কথা বলছিস সে বাড়ি হয়তো থাকলেও থাকতে পারে, একশো বছর আর এমন কী বেশি। তবে সেখানে গিয়ে যদি ভূতটুত দেখার লোভ থেকে থাকে তোর, তা হলে আমি ওর মধ্যে নেই। কিছু মনে করিসনি ভাই—আমি চিরকালই একটু অতিরিক্ত সেন্‌সিটিভ। এমনি দিব্যি আছি—আজকের দিনের শহরের কোনও উপদ্রব নেই এখানে—ভূতের পিছনে ছোটা মানে সাধ করে উপদ্রব ডেকে আনা। ওর মধ্যে আমি নেই!'

অনীকের কথা শুনে বুঝলাম এই বারো বছরে ও বিশেষ বদলায়নি। ইস্কুলে ভিতু বলে ওর বদনাম ছিল বটে। মনে পড়ল একবার আমাদের ক্লাসেরই জয়ন্ত আর আরও কয়েকটি ডানপিটে ছেলে ওকে এক সন্ধ্যায় বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডের রাইডিং স্কুলের কাছটাতে আপাতমস্তক সাদা কাপড় মুড়ি দিয়ে ভয় দেখিয়েছিল। অনীক এই ঘটনার পর দু'দিন ইস্কুলে আসেনি, এবং অনীকের বাবা নিজে হেডমাস্টার বীরেশ্বর বাবুর কাছে এসে ব্যাপারটা নিয়ে কমপ্লেন করেছিলেন।

আমি এ বিষয়ে কিছু বলার আগেই অনীক হঠাৎ বলে উঠল, 'তবে নেহাতই যদি তোর যেতে হয়, তা হলে সঙ্গীর অভাব হবে না। আসুন মিস্টার ব্যানার্জি।'

পিছন ফিরে দেখি একটি বছর পঁয়তাল্লিশের ভদ্রলোক অনীকের বাগানের গেট দিয়ে ঢুকে হাসিমুখে আমার দিকে এগিয়ে আসছেন। বেশ বলিষ্ঠ চেহারা, প্রায় ছ'ফুট হাইট, পরনে ছাই রঙের হ্যান্ডলুমের প্যান্টের উপর গাঢ় নীল টেরিলিনের বুশশার্টের গলায় সাদা-কালো বাটিকের ছোপ মারা সিল্কের মাফলার।

অনীক পরিচয় করিয়ে দিল 'আমার বন্ধু রঞ্জন সেনগুপ্ত—মিস্টার হৃষীকেশ ব্যানার্জি।'

ভদ্রলোক শুনলাম ব্যাঙ্গালোরে এয়ারক্রাফট্ ফ্যাক্টরিতে কাজ করেন, বহুদিন বাংলাদেশ ছাড়া, তাই কথার মধ্যে একটা অবাঙালি টান এসে পড়েছে, আর অজস্র ইংরিজি শব্দ ব্যবহার করেন।

অনীক বেয়ারাকে ডেকে আর এক পেয়ালা চায়ের কথা বলে দিয়ে একেবারে সোজাসুজি ব্রাউন সাহেবের বাড়ির কথাটা পেড়ে বসল। কথাটা শুনে ভদ্রলোক এমন অট্টহাস্য করে উঠলেন যে, কিছুক্ষণ থেকে যে কাঠবিড়ালিটাকে দেখছিলাম আমাদের

টেবিলের আশেপাশে নির্ভয়ে ঘোরাফেরা করছে, সেটা ল্যাজ উঁচিয়ে একটা দেবদারু গাছের গুঁড়ি বেয়ে সটান একেবারে মগডালে পৌঁছে গেল।

'গোস্টস? গোস্টস? ইউ সিরিয়াসলি বিলিভ ইন গোস্টস? আজকের দিনে? আজকের যুগে?'

আমি আমতা আমতা করে বললাম, 'একটা কৌতূহল থাকতে ক্ষতি কী? এমনও তো হতে পারে যে, ভূতেরও একটা বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা আছে, যেটা দশ বছরের মধ্যে জানা যাবে।'

ব্যানার্জির হাসি তবুও থামে না। লক্ষ করলাম ভদ্রলোকের দাঁতগুলো ভারী ঝকঝকে ও মজবুত।

অনীক বলল, 'যাই হোক মিস্টার ব্যানার্জি—গোস্ট অর নো গোস্ট—এমন বাড়ি যদি একটা থেকেই থাকে, আর রঞ্জনের যদি একটা উদ্ভট খেয়াল হয়েই থাকে—একটা সন্ধেবেলা ওকে নিয়ে খানিকটা সময়ের জন্য ও-বাড়িতে কাটিয়ে আসতে পারেন কিনা সেইটে বলুন। ও কলকাতা থেকে এসেছে, আমার গেস্ট—ওকে তো আর আমি একা যেতে দিতে পারি না সেখানে। আর সত্যি বলতে কি—আমি নিজে মানুষটা একটু অতিরিক্ত, যাকে বলে, সাবধানী। আমি যদি নিয়ে যাই তা হলে বোধহয় ওর সুবিধের চেয়ে অসুবিধেই হবে বেশি।'

মিস্টার ব্যানার্জি তাঁর শার্টের পকেট থেকে একটা বাঁকা পাইপ বার করে তার মধ্যে তামাক গুঁজতে গুঁজতে বললেন, 'আমার আপত্তি নেই—তবে আমি যেতে পারি কেবল একটা কন্ডিশনে—আমি সঙ্গে শুধু একজনকে নেব না, দু'জনকেই নেব।'

কথাটা শেষ করে ব্যানার্জি আবার হাসলেন, আর তার ফলে এবার আশেপাশের গাছ থেকে চার-পাঁচরকম পাখির চিৎকার ও ডানা-ঝাপটানির আওয়াজ শোনা গেল। অনীকের মুখ কিঞ্চিৎ ফ্যাকাসে দেখালেও, সে আপত্তি করতে পারল না।

'কী নাম বললেন বাড়িটার?' ব্যানার্জি জিজ্ঞেস করলেন।

'এভারগ্রিন লজ।'

'ফ্রেজার টাউনে?'

'তাই তো বলছে ডায়রিতে।'

'হুঁ...' ভদ্রলোক পাইপে টান দিলেন। 'ফ্রেজার টাউনে সাহেবদের কিছু পুরনো বাড়ি আছে বটে, কটেজ টাইপের। এনিওয়ে—যেতেই যদি হয় তো দেরি করে লাভ কী? হোয়াট অ্যাবাউট আজ বিকেল? এই ধরুন চারটে নাগাদ?'

ইঞ্জিনিয়ার হলে কী হবে—মেজাজটা একেবারে পুরোদস্তুর মিলিটারি এবং সাহেবি। ঘড়ি ধরে চারটের সময় হৃষীকেশ ব্যানার্জি তাঁর মরিস মাইনর গাড়িটি নিয়ে হাজির। গাড়িতে যখন উঠছি তখন ভদ্রলোক জিজ্ঞেস করলেন, 'সঙ্গে কী কী নিলেন?'

অনীক ফিরিস্তি দিল—একটা পাঁচসেলের টর্চ, ছ'টা মোমবাতি, ফার্স্ট-এড বক্স, একটা বড় ফ্লাস্ক ভর্তি গরম কফি, এক বাক্স হ্যাম স্যান্ডউইচ, এক প্যাকেট তাস, মাটিতে পাতবার চাদর, মশা তাড়ানোর জন্য এক টিউব ওডোমস।

'আর অস্ত্রশস্ত্র?' ব্যানার্জি জিজ্ঞেস করলেন।

'ভূতকে কি অস্ত্র দিয়ে কিছু করা যায়? কী রে রঞ্জন—তোর সাইমনের ভূত কি সলিড নাকি?'

'যাই হোক,' মিস্টার ব্যানার্জি গাড়ির দরজা বন্ধ করে বললেন, 'আমার কাছে একটি ছোটখাটো আগ্নেয়াস্ত্র আছে, সুতরাং সলিড-লিকুইড নিয়ে চিন্তা করার কোনও প্রয়োজন নেই।'

গাড়ি ছাড়ার পর ব্যানার্জি বললেন, 'এভারগ্রিন লজের ব্যাপারটা একেবারে কাল্পনিক নয়।'

আমি একটু অবাক হয়েই বললাম, 'আপনি কি এর মধ্যেই খোঁজ নিয়েছেন নাকি?'

ব্যানার্জি রীতিমতো কসরতের সঙ্গো দুটো সাইকেল চালককে পর পর পাশ কাটিয়ে বললেন, 'আই অ্যাম এ ভেরি মেথডিক্যাল ম্যান, মিস্টার সেনগুপ্ত। যেখানে যাচ্ছি, সে জায়গাটা অ্যাট অল আছে কিনা সেটার সম্বন্ধে আগে থেকেই খোঁজ নিয়ে রাখা উচিত নয় কি? ও দিকটায় শ্রীনিবাস দেশমুখ থাকে—আমরা একসঙ্গো গল্‌ফ খেলি—অনেকদিনের আলাপ। সকালে এখান থেকে ওর বাড়িতেই গেসলাম। বলল এভারগ্রিন লজ বলে একটা একতলা কটেজ নাকি প্রায় পঞ্চাশ বছর থেকে খালি পড়ে আছে। বাড়ির বাইরের বাগানে বছর দশেক আগে পর্যন্ত লোকে পিক্‌নিক্ করতে যেত, এখন আর যায় না। খুব নিরিবিলি জায়গায় বাড়িটা। আগেও নাকি একটানা বেশিদিন কেউ ও বাড়িতে থাকেনি। তবে হন্টেড হাউস বলে কেউ কোনওদিন অপবাদ দেয়নি বাড়িটার। বাড়ির ফার্নিচার সব বহুদিন আগেই নিলাম হয়ে গেছে। আর কিছু নাকি কর্নেল মার্সারের বাড়িতে আছে। রিটায়ার্ড আর্মি অফিসার। তিনিও ফ্রেজার টাউনেই থাকতেন। সব শুনেটুনে, বুঝেছেন মিস্টার সেনগুপ্ত, মনে হচ্ছে আমাদেরও এই পিক্‌নিক্ জাতীয়ই একটা কিছু করে ফেরত আসতে হবে। অনীকেন্দ্র তাসটা এনে ভালই করেছে।'

ব্যাঙ্গালোরের পরিষ্কার প্রশস্ত রাস্তা দিয়ে গাড়ি করে যেতে যেতে বারবারই মনে হচ্ছিল যে শহরটা এতই অভুতুড়ে যে, এখানে একটা হানাবাড়ির অস্তিত্বই কল্পনা করাই কঠিন।

কিন্তু তার পরেই আবার মনে পড়ে যাচ্ছিল ব্রাউন সাহেবের ডায়রির কথা। লোকে নেহাত পাগল না হলে ডায়রিতে আজগুবি কথা বানিয়ে লিখবে কেন? সাইমনের ভূত ব্রাউন নিজে দেখেছেন। একবার নয়, অনেকবার। সে ভূত কি আমাদের জন্য একবার দেখা দেবে না?

বিলেতে আমি যাইনি, কিন্তু বিলেতের কটেজের ছবি বইয়ের পাতায় ঢের দেখেছি। এভারগ্রিন লজের সামনে দাঁড়িয়ে মনে হল সত্যিই যেন ইংল্যান্ডের কোনও গ্রামাঞ্চলের একটা পুরনো পরিত্যক্ত বাড়ির সামনে এসে পড়েছি।

কটেজের সামনেই ছিল বাগান। সেখানে ফুলের কেয়ারির বদলে এখন শুধু ঘাস আর আগাছা। একটা ছোট্ট কাঠের গেট (যাকে ইংরেজিতে বলে wicket) দিয়ে বাগানে ঢুকতে হয়। সেই গেটের গায়ে একটা ফলকে খোদাই করে এখনও লেখা রয়েছে বাড়ির নামটা। তবে হয়তো কোনও চড়ুইভাতির দলেরই কেউ রসিকতা করে এভারগ্রিন কথাটার আগে একটা N জুড়ে দিয়ে সেটাকে নেভারগ্রিন করে দিয়েছে।

আমরা গেট দিয়ে ঢুকে বাড়ির দিকে এগোলাম। চারিদিকে অজস্র গাছপালা। ইউক্যালিপটাসও গোটা তিনেক রয়েছে দেখলাম। আর যা গাছ আছে তার অনেকগুলোরই নাম আমার জানা নেই, চোখেও দেখিনি এর আগে কোনওদিন। ব্যাঙ্গালোরের জলমাটির নাকি এমনই গুণ যে, সেখানে যে-কোনও দেশের যে-কোনও গাছই বেঁচে থাকে।

কটেজের সামনে একটা টালির ছাউনি দেওয়া পোর্টিকো, তার বাঁকা থামগুলো বেয়ে লতা উঠেছে ওপর দিকে। ছাউনির অনেক টালিই নেই, ফলে ফাঁক দিয়ে আকাশ দেখা যায়। সামনের দরজার একটা পাল্লা ভেঙে কাত হয়ে আছে। বাড়ির সামনের দিকের দরজা-জানলার কাচ অধিকাংশই ভাঙা। দেয়ালের ওপর শেওলা ধরে এমন অবস্থা হয়েছে যে বাড়ির আসল রঙটা যে কী ছিল তা আজ বোঝার উপায় নেই।

দরজা দিয়ে বাড়ির ভিতরে ঢুকলাম আমরা।

ঢুকেই একটা প্যাসেজ। পিছন দিকে একটা ভাঙা দরজার ভিতর দিয়ে একটা ঘর দেখা যাচ্ছে। আমাদের ডাইনে-বাঁয়েও ঘর। ডাইনেরটাই বেশি বড় বলে মনে হল। আন্দাজে বুঝলাম এটাই হয়তো বৈঠকখানা ছিল। মেঝেতে বিলিতি কায়দায় কাঠের তক্তা বসানো—তার কোনওটাই প্রায় আস্ত নেই। সাবধানে পা ফেলতে হয়, এবং প্রতি পদক্ষেপে খুটখাট খচখচ শব্দ থাকে।

আমরা ঘরটাতে ঢুকলাম।

বেশ বড় ঘর, ফার্নিচার না থাকাতে আরও খাঁ খাঁ করছে। পশ্চিম আর উত্তর দিকে জানলার সারি। একদিকের জানলা দিয়ে গেট সমেত বাগান, আর অন্যদিক দিয়ে গাছের সারি দেখা যাচ্ছে। এরই একটাতে কি বাজ পড়েছিল? সাইমন দাঁড়িয়েছিল সেই গাছের নীচে। তৎক্ষণাৎ মৃত্যু। ভাবতে গা-টা ছম্‌ছম্‌ করে উঠল।

এবারে দক্ষিণ দিকের জানলাবিহীন দেয়ালের দিকে চাইলাম। বাঁ কোণে ফায়ারপ্লেস। এই ফায়ারপ্লেসের পাশেই ছিল সাইমনের প্রিয় চেয়ারখানা।

ঘরের সিলিং-এর দিকে চাইতে চোখে পড়ল ঝুল আর মাকড়সার জাল। এককালে সুদৃশ্য এভারগ্রিন লজের অবস্থা এখন খুবই শোচনীয়।

মিস্টার ব্যানার্জি প্রথমদিকে লা লা করে বিলিতি সুর ভাঁজছিলেন, এখন নতুন করে পাইপ ধরিয়ে বললেন, 'কী খেলা আসে আপনাদের? ব্রিজ, না পোকার, না রামি?'

অনীক হাতের জিনিসপত্র মেঝেতে সাজিয়ে চাদরটা বিছিয়ে মাটিতে বসতে যাচ্ছিল, এমন সময় একটা শব্দ কানে এল।

অন্য কোনও ঘরে কেউ জুতো পায়ে হাঁটছে।

অনীকের দিকে চেয়ে দেখলাম সে ফ্যাকাশে হয়ে গেছে।

পায়ের শব্দটা থামল। মিস্টার ব্যানার্জি হঠাৎ মুখ থেকে পাইপটা নামিয়ে নিয়ে বাজখাঁই গলায় চেঁচিয়ে উঠলেন—'ইজ এনিবডি দেয়ার?' সঙ্গে সঙ্গে আমরা তিনজনে প্যাসেজের দিকে এগোলাম। অনীক আলতো করে আমার কোটের আস্তিনটা ধরে নিয়েছে।

এবার জুতোর শব্দটা আবার শুরু হল। আমরা বাইরে প্যাসেজে গিয়ে পড়তেই ডানদিকের ঘরটা থেকে একটি ভদ্রলোক বেরিয়ে এসে সামনে আমাদের দেখে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন। লোকটি ভারতীয়। মুখ ভর্তি খোঁচা খোঁচা দাড়িগোঁফ সত্ত্বেও ইনি যে ভদ্র এবং শিক্ষিত তাতে কোনও সন্দেহ নেই। ভদ্রলোক বললেন, 'হ্যালো।'

আমরা কী বলব ঠিক বুঝতে পারছি না, এমন সময় আগন্তুক নিজেই আমাদের কৌতূহল নিবৃত্ত করলেন।

'আমার নাম ভেঙ্কটেশ। আই অ্যাম এ-পেন্টার। আপনারা কি এই বাড়ির মালিক না খদ্দের?'

ব্যানার্জি হেসে বললেন, 'দুটোর একটাও না। আমরা এমনি ঘুরতে ঘুরতে এসে পড়েছি।'

'আই সী। আমি ভাবছিলাম এই বাড়িটা যদি পাওয়া যেত তা হলে আমার কাজের জন্য একটা স্টুডিও হতে পারত। ভাঙাচোরায় আমার আপত্তি নেই। মালিক কে জানেন না বোধহয়?'

'আজ্ঞে না। সরি।' ব্যানার্জি বললেন। 'তবে আপনি কর্নেল মার্সারের ওখানে খোঁজ করে দেখতে পারেন। সামনের রাস্তা ধরে বাঁ দিকে চলে যাবেন। মিনিট পাঁচেকের হাঁটা পথ।'

'থ্যাঙ্ক ইউ' বলে মিস্টার ভেঙ্কটেশ বেরিয়ে চলে গেলেন।

গেট খোলার এবং বন্ধ করার শব্দ পাবার পর ব্যানার্জি আবার তাঁর অট্টহাসি হেসে বললেন, 'মিস্টার সেনগুপ্ত, ইনি নিশ্চয়ই আপনার সাইমন বা ওই জাতীয় কোনও ভূতটুত নন!'

আমি হেসে বললাম, 'সবেমাত্র সোয়া পাঁচটা, এর মধ্যেই আপনি ভূতের আশা করেন কী করে? আর ইনি ভূত হলেও ঊনবিংশ শতাব্দীর নিশ্চয়ই নন, কারণ তা হলে পোশাকটা অন্যরকম হত।'

আমরা ইতিমধ্যে বৈঠকখানায় ফিরে এসেছি। অনীক মাটিতে পাতা চাদরের উপর বসে পড়ে বলল, 'মিথ্যে কল্পনার প্রশ্রয় দিয়ে নার্ভাসনেস বাড়ানো! তার চেয়ে তাস হোক।'

'আগে মোমবাতি খানকতক জ্বালাও দেখি,' ব্যানার্জি বললেন, 'এখানে বড় ঝপ্ করে সন্ধে নামে।'

দুটো মোমবাতি জ্বালিয়ে কাঠের মেঝেতে দাঁড় করিয়ে ফ্লাস্কের ঢাকনিতে কফি ঢেলে তিনজনে পালা করে খেয়ে নিলাম। একটা কথা আমার কিছুক্ষণ থেকে মনে আসছিল সেটা আর না বলে পারলাম না। ভূতের নেশা যে আমার ঘাড়ে কীভাবে চেপেছে সেটা আমার এই কথা থেকেই বোঝা যাবে। ব্যানার্জিকে উদ্দেশ করে বললাম, 'আপনি বলেছিলেন কর্নেল মার্সার এ-বাড়ির ফার্নিচার কিছু কিনেছিলেন। তিনি যদি এতই কাছে থাকেন তা হলে তাঁর বাড়িতে গিয়ে একটা জিনিসের খোঁজ করে আসা যায় কি?'

'কী জিনিস?' ব্যানার্জি প্রশ্ন করলেন।

একটা বিশেষ ধরনের হাই-ব্যাক্‌ড চেয়ার।'

অনীক যেন একটু বিরক্ত হয়েই বললে, 'কেন বল্ তো ? হঠাৎ এখন হাই-ব্যাক্‌ড চেয়ারের খোঁজ করে কী হবে?'

'না, মানে, ব্রাউন সাহেব বলেছেন ওটা নাকি সাইমনের খুব প্রিয় চেয়ার ছিল। সে ভূত হয়েও ওটাতে এসে বসত। ওটা থাকত ওই ফায়ারপ্লেসটার পাশে। হয়তো ওটা ওখানে এনে রাখতে পারলে—'

অনীক বাধা দিয়ে বলল, 'তুই ব্যানার্জি সাহেবের ওই মরিস গাড়িতে করে হাই-ব্যাক্‌ড চেয়ার নিয়ে আসবি? না কি আমরা তিনজনে ওটাকে কাঁধে করে আনব? তোর কি মাথা খারাপ হয়েছে?'

ব্যানার্জি এবার হাত তুলে আমাদের দু'জনকেই থামিয়ে দিয়ে বললেন, 'কর্নেল মার্সার যা কিনেছেন তার মধ্যে ওরকম চেয়ার নেই এটা আমি জানি। তাঁর বাড়িতে আমার যথেষ্ট যাতায়াত আছে। ওটা থাকলে আমার চোখে পড়ত। আমি যতদূর জানি উনি কিনেছিলেন দুটো বুক কেস, দুটো অয়েল পেন্টিং, খানকতক ফুলদানি, আর শেল্‌ফে সাজিয়ে রাখার জন্য গুটিকতক শখের জিনিস, যাকে আর্ট অবজেক্টস বলে।'

আমি দমে গেলাম। অনীক তাস বার করে সাফল করতে আরম্ভ করেছে। ব্যানার্জি বললেন, 'রামিই হোক। আর এসব খেলা জমে ভাল যদি পয়সা দিয়ে খেলা যায়। আপনাদের আপত্তি আছে কি?'

বললাম, 'মোটেই না। তবে আমি ব্যাঙ্কের সামান্য চাকুরে, বেশি হারাবার সামর্থ্য আমার নেই।'

বাইরে দিনের আলো ম্লান হয়ে এসেছে। আমরা খেলায় মন দিলাম। আমার তাসের ভাগ্য কোনওদিনই ভাল না। আজও তার ব্যতিক্রম লক্ষ্য করলাম না। আমি জানি অনীক মনে মনে নার্ভাস হয়ে আছে, সুতরাং সে জিতলে পরে আমি অন্তত একটু নিশ্চিন্ত হতাম, কিন্তু তারও কোনও লক্ষণ দেখলাম না। কপাল ভাল একমাত্র মিস্টার ব্যানার্জির। গুনগুন করে বিলিতি সুর ভাঁজছেন, আর দানের পর দান জিতে চলেছেন। খেলতে খেলতে নিস্তব্ধতার মধ্যে একবার একটা বেড়ালের ডাক শুনলাম। তার ফলে আমার মনটা আরও যেন একটু দমে গেল। হানাবাড়িতে বেড়ালেরও থাকা উচিত নয়। কথাটা বলাতে ব্যানার্জি হেসে বললেন, 'বাট ইট ওয়াজ এ ব্ল্যাক ক্যাট—ওই প্যাসেজ দিয়ে হেঁটে গেল। ব্ল্যাক ক্যাট তো ভূতের সঙ্গো যায় ভালই—তাই না?'

খেলা চলতে থাকল। বেশ কিছুক্ষণের জন্য একবার মাত্র একটা অজানা পাখির কর্কশ ডাক ছাড়া আর কোনও শব্দ, দৃশ্য বা ঘটনা আমাদের একাগ্রতায় বাধা পড়তে দেয়নি।

ঘড়িতে সাড়ে ছ'টা, বাইরের আলো নেই বললেই চলে, আমি একটু ভাল তাস পেয়ে পর পর দু'বার জিতেছি, আর এক রাউন্ড রামি হয়ে গেছে ইতিমধ্যে, এমন সময় হঠাৎ একটা অস্বাভাবিক শব্দ কানে এল।

কে যেন বাইরের দরজায় টোকা মারছে।

আমাদের তিনজনেরই হাত তাসসুদ্ধ নিচে নেমে এল।

টক টক্ টক্ টক্।

অনীক এবার আরও ফ্যাকাশে। আমার বুকের ভিতরেও মৃদু কম্পন শুরু হয়েছে। কিন্তু ব্যানার্জি দেখলাম সত্যিই ঘাবড়াবার লোক নন। হঠাৎ নিস্তব্ধতা ভেদ করে তাঁর বাজখাঁই গলায় চেঁচিয়ে উঠলেন, 'হু ইজ ইট?'

আবার দরজায় টোকা—টক্ টক্ টক্।

ব্যানার্জি তদন্ত করার জন্য তড়াক করে উঠে পড়লেন। আমি খপ করে ভদ্রলোকের প্যান্টটা ধরে চাপা গলায় বললাম, 'একা যাবেন না।'

তিনজনে একসঙ্গো ঘর থেকে বেরোলাম। প্যাসেজে এসে বাঁ দিকে চাইতেই দেখলাম দরজার বাইরে একজন লোক দাঁড়িয়ে আছে—তার পরনে সুট ও হাতে একটা লাঠি। অন্ধকারে তাকে চেনার কোনও উপায় নেই। অনীক আবার আমার আস্তিন চেপে ধরল। এবার আরও জোরে। ওর অবস্থা দেখেই বোধহয় আমার মনে আপনা থেকেই একটা সাহসের ভাব এল।

ব্যানার্জি ইতিমধ্যে আরও কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলেন, 'ও-হ্যালো, ডক্টর লার্কিন! আপনি এখানে?'

এবার আমিও প্রৌঢ় সাহেবটিকে বেশ ভালভাবেই দেখতে পেলাম। অমায়িক সাহেবটি তাঁর সোনার চশমার পিছনে নীল চোখ দুটোকে কুঁচকে হেসে বললেন, 'তোমার মরিস গাড়িখানা দেখলাম বাইরে। তারপর দেখি বাড়ির জানলা দিয়ে মোমবাতির আলো দেখা যাচ্ছে। তাই ভাবলাম একবার ঢুঁ মেরে দেখে যাই তুমি কী পাগলামি করছ এই পোড়ো বাড়ির ভেতর।'

ব্যানার্জি হেসে বললেন, 'আমার এই যুবক বন্ধু দুটির একটু উদ্ভট ধরনের অ্যাডভেঞ্চারের শখ। বলল, এভারগ্রিন লজে বসে তাস খেলবে, তাই আর কি!'

'ভেরি গুড, ভেরি গুড! যুবা বয়সটাই তো এ-ধরনের পাগলামির সময়। আমরা বুড়োরাই কেবল নিজেদের বাড়ির কৌচে বসে রোমন্থন করি। ওয়েল ওয়েল—হ্যাভ এ গুড টাইম!'

লার্কিন সাহেব হাত তুলে গুডবাই করে লাঠি ঠক্ ঠক্ করতে করতে চলে গেলেন, আর সঙ্গো সঙ্গো দ্বিতীয়বার ভূতের আশা পরিত্যাগ করতে হল। কী আর করি, আবার তাসে মনোনিবেশ করলাম। প্রথমদিকে প্রায় সাড়ে চার টাকার মতো হারছিলাম, গত আধঘণ্টায় তার খানিকটা ফিরে পেয়েছি। সাইমনের ভূত না দেখলেও, শেষ পর্যন্ত তাসে কিছু জিতে বাড়ি ফিরতে পারলেও আজকের আউটিংটা কিছুটা সার্থক হয়।

ঘড়ির দিকে মাঝে মাঝেই চোখটা চলে যাচ্ছিল। আসল ঘটনাটা কখন ঘটেছিল তার টাইম আমার জানা আছে। ব্রাউন সাহেবের ডায়রি থেকে জেনেছিলাম যে সন্ধ্যার এই সময়টাতেই বাজ পড়ে সাইমনের মৃত্যু হয়।

আমি তাস বাঁটছি, মিস্টার ব্যানার্জি তাঁর পাইপে আগুন ধরাচ্ছেন, অনীক সবেমাত্র স্যান্ডউইচ খাবার মতলবে প্যাকেটটাতে হাত লাগিয়েছে, এমন সময় তার চোখের চাহনিটা মুহূর্তের মধ্যে বদলে গিয়ে সঙ্গো সঙ্গো তার সমস্ত অঙ্গাপ্রত্যঙ্গা আড়ষ্ট হয়ে গেল।

তার দৃষ্টি দরজার বাইরে প্যাসেজের দিকে। বাকি দু'জনের চোখও স্বভাবতই সেদিকে চলে গেল। যা দেখলাম তাতে আমারও কয়েক মুহূর্তের জন্য গলা শুকিয়ে নিশ্বাস বন্ধ হয়ে গেল।

বাইরে প্যাসেজের অন্ধকারের মধ্যে একজোড়া জ্বলন্ত চোখ আমাদের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে। ফসফরাসের মতো ফিকে সবুজ আর হলদে মেশানো একটা আভা এই নিষ্পলক চাহনিতে।

মিস্টার ব্যানার্জির ডানহাতটা ধীরে ধীরে তাঁর কোটের ভেস্ট পকেটের দিকে চলে গেল। আর ঠিক সেই মুহূর্তেই যেন ম্যাজিকের মতো আমার কাছে ব্যাপারটা জলের মতো পরিষ্কার হয়ে গিয়ে আমার মন থেকে সমস্ত ভয় দূর করে দিল। বললাম, 'আপনার পিস্তলের দরকার নেই মশাই—এটা সেই কালো বেড়ালটা।'

আমার কথায় অনীকও যেন ভরসা পেল। ব্যানার্জি পকেট থেকে তাঁর হাত বার করে এনে চাপা গলায় বললেন, 'হাউ রিডিকুলাস।'

এবার জ্বলন্ত চোখ দুটো আমাদের ঘরের দিকে এগিয়ে এল। চৌকাঠ পেরোতেই মোমবাতির আলোতে প্রমাণ হল আমার কথা। এটা সেই কালো বেড়ালটাই বটে!

চৌকাঠ পেরিয়ে বেড়ালটা বাঁ দিকে ঘুরল। আমাদের দৃষ্টি তার সঙ্গো সঙ্গো ঘুরছে, তাকে অনুসরণ করছে।

এবারে আমাদের তিনজনের গলা দিয়ে একসঙ্গো একটা শব্দ বেরিয়ে পড়ল। আচমকা বিস্ময়ের ফলে যে-শব্দ আপনা থেকেই মানুষের মুখ থেকে বেরোয়—এ সেই শব্দ। এই শব্দের কারণ আর কিছুই না—আমরা যতক্ষণ তন্ময় হয়ে তাস খেলেছি তারই ফাঁকে কীভাবে কোত্থেকে জানি একটা গাঢ় লাল মখমলে মোড়া হাই-ব্যাক্‌ড চেয়ার এসে ফায়ার প্লেসের পাশে তার জায়গা করে নিয়েছে।

অমাবস্যার রাতের অন্ধকারের মতো কালো বেড়ালটা চেয়ারটার দিকে নিঃশব্দে এগিয়ে গেল। তারপর এক মুহূর্ত সেটার সামনে দাঁড়িয়ে একটা নিঃশব্দ লাফে সেটার ওপর উঠে কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে পড়ল। আর সেই মুহূর্তে একটা অদ্ভুত শব্দ শুনে আমার রক্ত হিম হয়ে গেল। কোনও এক অশরীরী বৃদ্ধের খিলখিলে হাসির ফাঁকে ফাঁকে বারবার উচ্চারিত হচ্ছে—"সাইমন সাইমন সাইমন সাইমন"—আর তার সঙ্গে ছেলেমানুষি খুশি হওয়া হাততালি।

একটা আর্তনাদ শুনে বুঝলাম অনীক অজ্ঞান হয়ে গেছে। আর মিস্টার ব্যানার্জি? তিনি অনীককে কোলপাঁজা করে তুলে ঊর্ধ্বশ্বাসে প্যাসেজ দিয়ে দরজার দিকে ছুটছেন।

আমিও আর থাকতে পারলাম না। তাস মোমবাতি ফ্লাস্ক চাদর স্যান্ডউইচ সব পড়ে রইল। দরজা পেরিয়ে মাঠ, মাঠ পেরিয়ে গেট, গেট পেরিয়ে ব্যানার্জির মরিস মাইনর।

ভাগ্যে ব্যাঙ্গালোরের রাস্তায় লোক চলাচল কম, নইলে আজ একটিমাত্র পাগলা গাড়ির পাগলা ছুটে ক'টা লোক যে জখম হতে পারত তা ভাবলেও গায়ে কাঁটা দেয়।

অনীকের জ্ঞান গাড়িতেই ফিরে এসেছিল, কিন্তু তার মুখে কোনও কথা নেই। প্রথম কথা বললেন মিস্টার ব্যানার্জি। অনীকের বেয়ারার হাত থেকে ব্র্যান্ডির গেলাসটা ছিনিয়ে নিয়ে এক ঢোকে অর্ধেকটা নামিয়ে দিয়ে ঘড়ঘড়ে চাপা গলায় বলে উঠলেন, 'সো সাইমন ওয়াজ এ ক্যাট!'

আমার নিজেরও কিছুই বলার অবস্থা নেই, কিন্তু আমার মন তাঁর কথায় সায় দিল।

সত্যিই, ব্রাউন সাহেবের বুদ্ধিমান, খামখেয়ালি, অভিমানী, অনুগত, আদরের সাইমন—যার মৃত্যু হয় বজ্রাঘাতে আজ থেকে একশো তেরো বছর আগে—সেই সাইমন ছিল আমাদের আজকের দেখা একটি পোষা কালো বেড়াল! □

বিভূতি
আর সেই
জোড়া

ট্রেন থেকে প্ল্যাটফর্মে নেমে এদিক-ওদিক দেখে রতনবাবুর মনে একটা খুশির ভাব জেগে উঠল। জায়গাটা তো ভাল বলেই মনে হচ্ছে। স্টেশনের পিছনে শিরীষ গাছটা কেমন মাথা উঁচিয়ে রয়েছে, তার ডালে আবার একটা লাল ঘুড়ি আটকে রয়েছে। লোকজনের মধ্যে ব্যস্ততার ভাব নেই, বাতাসে কেমন একটা সোঁদা গন্ধ—সব মিলিয়ে দিব্যি মনোরম পরিবেশ।

সঙ্গে একটা ছোট হোল্ডল আর চামড়ার একটা ছোট সুটকেস। কুলির দরকার নেই; রতনবাবু সেগুলো দু'হাতে তুলে নিয়ে স্টেশনের গেটের দিকে এগিয়ে গেলেন।

বাইরে সাইকেল-রিকশা পেতে কোনও অসুবিধা হল না। ডোরাকাটা হাফপ্যান্ট পরা ছোকরা চালক জিজ্ঞেস করল, 'কোথায় যাবেন বাবু?'

রতনবাবু বললেন, 'নিউ মহামায়া হোটেল—জানো?'

ছোকরা ছোট্ট করে মাথা নেড়ে বলল, 'উঠুন।'

ভ্রমণ জিনিসটা রতনবাবুর একটা বাতিক বলেই বলা যেতে পারে। সুযোগ পেলেই তিনি কলকাতার বাইরে কোথাও ঘুরে আসেন। অবিশ্যি সুযোগ যে সবসময় আসে তা নয়, কারণ রতনবাবুর একটা চাকরি আছে। কলকাতার জিয়োলজিকাল সার্ভের আপিসে তিনি একজন কেরানি। আজ চব্বিশ বচ্ছর ধরে তিনি এই চাকরি করছেন। তাই বাইরে বেড়িয়ে আসার মতো সুযোগ তাঁর বছরে একবারই আসে। পুজোর ছুটির সঙ্গে তাঁর বাৎসরিক পাওনা ছুটি জুড়ে নিয়ে তিনি প্রতি বছরই কোথাও না কোথাও ভ্রমণ করে আসেন।

এই বেড়ানোর ব্যাপারে রতনবাবু সঙ্গে আর কাউকে নেন না, বা নেবার ইচ্ছেটাও তাঁর মনে জাগে না। প্রথম প্রথম যে সঙ্গীর অভাব বোধ করতেন না তা নয়; তাঁর পাশের টেবিলের কেশববাবুর সঙ্গে এককালে তাঁর এই নিয়ে কথা হয়েছিল, মহালয়ার কয়েকদিন আগে। রতনবাবু তখন সবে ছুটির প্ল্যান করেছেন; তিনি বলেছিলেন, 'আপনিও তো মশাই একা মানুষ—চলুন না এবার পুজোয় দু'জনে একসঙ্গে কোথাও ঘুরে-টুরে আসি।'

কেশববাবু তাঁর কলমটা কানে গুঁজে হাত দুটোকে জড়ো করে তাঁর দিকে চেয়ে

মাথা নেড়ে মৃদু হেসে বলেছিলেন, 'আপনার পছন্দর সঙ্গো আমার পছন্দ কি মিলবে? আপনি যাবেন সব উদ্ভট নাম-না-জানা জায়গায়। সেখানে না আছে দেখবার কিছু, না আছে থাকা-খাওয়ার সুবিধে। আমায় মাফ করবেন। আমি যাচ্ছি হরিনাভিতে আমার ভায়রাভাইয়ের কাছে।'

ক্রমে রতনবাবু বেশ বুঝতে পেরেছিলেন যে, তাঁর মনের সঙ্গো মন মিলিয়ে বন্ধু পাওয়া খুবই শক্ত। তাঁর পছন্দ-অপছন্দ ব্যাপারটা সাধারণ লোকের সঙ্গো একেবারেই মেলে না। কাজেই বন্ধু পাওয়ার আশাটা পরিত্যাগ করাই ভাল।

সত্যিই রতনবাবুর স্বভাব-চরিত্রে বেশ একটা অভিনবত্ব ছিল। যেমন এই চেঞ্জে যাওয়ার ব্যাপারটা। কেশববাবু মোটেই ভুল বলেননি। লোকে সচরাচর যেসব জায়গায় চেঞ্জে যায়, রতনবাবু সেদিকে দৃষ্টিই দিতেন না। তিনি বলতেন, 'আরে মশাই—পুরীতে সমুদ্র আছে, জগন্নাথের মন্দির আছে; দার্জিলিং থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখা যায়; হাজারিবাগে পাহাড় আছে, জঙ্গাল আছে, রাঁচির কাছে হুড্রু ফল্‌স আছে এসব কথা তো সকলেই জানে। আর লোকমুখে একটা জিনিসের বর্ণনা বারবার শোনা মানে তো সে জিনিস প্রায় দেখাই হয়ে গেল।'

রতনবাবুর যেটা দরকার সেটা হল রেলের স্টেশনের ধারে একটি ছোট্ট শহর। ব্যস—আর কিচ্ছু না! প্রতি বছরই ছুটির আগে টাইম-টেবল খুলে, খুব বেশি দূরে নয় এমন একটি জায়গার নাম বের করে তিনি দুর্গা বলে বেরিয়ে পড়েন। কোথায় গেলেন কী দেখলেন, তা কেউ জিজ্ঞেস করে না, বা কাউকে তিনি বলেনও না। এমন অনেকবার হয়েছে যে, যেখানে গেছেন সে জায়গার নাম তিনি আগে শোনেনইনি। আর যেখানেই গেছেন, সেখানেই এমন একটা কিছু খুঁজে পেয়েছেন যার ফলে তাঁর মন খুশিতে ভরে উঠেছে। অন্যদের চোখে হয়তো এসব জিনিস খুবই সামান্য—যেমন রাজাভাতখাওয়ায় একটা বুড়ো অশ্বত্থ গাছ—যেটা একটা কুলগাছ আর একটা নারকেল গাছকে পাকিয়ে উঠেছে, মহেশগঞ্জে একটা নীলকুঠির ভগ্নাবশেষ, ময়নাতে একটা মিষ্টির দোকানের ডালের বরফি.....

এবারে রতনবাবু যেখানে এসেছেন সে জায়গাটার নাম সিনি। টাটানগর থেকে পনেরো মাইল দূরে এই শহর। এ জায়গাটা অবশ্য টাইম-টেবল থেকে বার করেননি তিনি। আপিসের অনুকূল মিত্তির বলেন জায়গাটার কথা। নিউ মহামায়া হোটেলের নামটাও তাঁর কাছ থেকেই পাওয়া।

রতনবাবুর চোখে হোটেলটাকে বেশ ভালই বলে মনে হল। ঘরটা ছোট—তবে তাতে কিছু এসে যায় না। পুব-দক্ষিণ দু'দিকে দুটো জানলা রয়েছে—তাই দিয়ে বেশ চমৎকার দৃশ্য দেখা যায়। পঞ্চা চাকরটিকেও বেশ অমায়িক বলে মনে হল। রতনবাবু শীত-গ্রীষ্ম দু'বেলা গরম জলে স্নান করেন, পঞ্চা তাঁকে আশ্বাস দিল তার জন্য কোনও চিন্তা করতে হবে না। হোটেলের রান্নাটা মোটামুটি চলনসই, এবং

সেটাই যথেষ্ট, কারণ খাওয়ার ব্যাপারেও রতনবাবু মোটেই খুঁতখুঁতে নন। শুধু একটি বায়না তাঁর আছে—ভাত আর হাতের রুটি—এ দুটোই একসঙ্গে না হলে তাঁর খাওয়া হয় না। মাছের ঝোলের সঙ্গে ভাত, আর ডাল তরকারির সঙ্গে রুটি—এটাই তাঁর রেওয়াজ। হোটেলে এসেই পঞ্চাকে তিনি কথাটা জানিয়ে দিয়েছেন, এবং পঞ্চাও সে খবর ম্যানেজারকে পৌঁছে দিয়েছে।

নতুন জায়গায় এলে প্রথম দিনই বিকেলে হেঁটে না বেরোনো পর্যন্ত রতনবাবু সোয়াস্তি বোধ করেন না।

সিনিতেও এ নিয়মের ব্যতিক্রম হল না। চারটের সময় পঞ্চার এনে দেওয়া চা খেয়েই রতনবাবু বেরিয়ে পড়লেন।

শহর থেকে বেরোলেই খোলা অসমতল প্রান্তর। তার মধ্যে দিয়ে আবার এদিক-ওদিক হাঁটা-পথ চলে গেছে। এই পথের একটা দিয়ে মাইলখানেক গিয়ে রতনবাবু একটা ভারী মনোরম জিনিস আবিষ্কার করলেন। একটা ছোট্ট ডোবা পুকুর,—তার মধ্যে কিছু শালুক ফুটে আছে, আর তার চারিদিকে অজস্র পাখির জটলা। বক, ডাহুক, কাদাখোঁচা, মাছরাঙা—এগুলো রতনবাবুর চেনা; বাকিগুলো এই প্রথম তিনি দেখলেন।

প্রতিদিন বিকেলবেলাটা এই ডোবার ধারে বসেই হয়তো রতনবাবু বাকি ছুটিটা কাটিয়ে দিতে পারতেন, কিন্তু দ্বিতীয় দিন আরও কিছু আবিষ্কারের আশায় রতনবাবু অন্য আরেকটা পথ দিয়ে হাঁটতে শুরু করলেন।

মাইলখানেক যাবার পর পথে একপাল ছাগল পড়ার দরুন তাঁর হাঁটা কিছুক্ষণের জন্য বন্ধ রাখতে হল। রাস্তা খালি হবার পর আরও মিনিটপাঁচেক হাঁটতেই দেখলেন সামনে একটা কাঠের পুল দেখা যাচ্ছে। আরও এগিয়ে গিয়ে বুঝলেন সেটা একটা ওভারব্রিজ। তার নীচ দিয়ে চলে গেছে রেলের লাইন। পুবদিকে দূরে স্টেশনটা দেখা যাচ্ছে, আর পশ্চিমদিকে যতদূর চোখ যায় সোজা চলে গেছে সমান্তরাল দুটো লোহার পাত। এখন যদি হঠাৎ একটা ট্রেন এসে পড়ে, আর ব্রিজের তলা দিয়ে সেটা যদি যায় তা হলে কী অদ্ভুত ব্যাপার হবে, সেটা ভাবতেই রতনবাবুর গায়ে কাঁটা দিল।

একদৃষ্টে রেললাইনের দিকে দেখছিলেন বলেই বোধহয় কখন যে আরেকটি লোক এসে তাঁর পাশে দাঁড়িয়েছে সেটা রতনবাবু খেয়াল করেননি, তাই পাশে তাকাতেই তাঁকে চমকে উঠতে হল।

লোকটির পরনে ধুতি শার্ট, কাঁধে একটা নস্যি রঙের র‍্যাপার, পায়ে ক্যাম্বিসের জুতো, চোখে বাইফোক্যাল চশমা। রতনবাবুর কেমন জানি খটকা লাগল। এঁকে কি আগে দেখেছেন কোথাও? চেনা চেনা মনে হচ্ছে না? মাঝারি হাইট, গায়ের রঙও মাঝারি, চোখের দৃষ্টিতে কেমন উদাস ভাবুক ভাবুক ভাব। বয়স কত হবে? পঞ্চাশের বেশি নয় নিশ্চয়ই। চুলে বিশেষ পাক ধরেনি। অন্তত সন্ধ্যার আলোতে তো তাই মনে হয়।

আগন্তুক একটা ঠাণ্ডা হাসি হেসে রতনবাবুকে নমস্কার করলেন। রতনবাবু হাত জোড় করে প্রতিনমস্কার করতে গিয়ে হঠাৎ বুঝে ফেললেন কেন তাঁর খটকা লাগছিল। লোকটিকে চেনা চেনা মনে হবার কারণ আর কিছুই না—এই ধাঁচের একটি চেহারা রতনবাবু বহুবার দেখেছেন—এবং সেটা তাঁর আয়নায়। ভদ্রলোকের চেহারার সঙ্গে তাঁর নিজের চেহারার আশ্চর্য মিল। মুখের চৌকোনা ভাব, চুলের টেরি, গোঁফের ধাঁচ, থুতনির মাঝখানে খাঁজ, কানের লতি—এসবই প্রায় হুবহু এক। তবে গায়ের রঙ আগন্তুকের যেন একটু বেশি ময়লা, ভুরু একটু বেশি ঘন, আর মাথার পিছনের চুল যেন একটু বেশি লম্বা।

এবার আগন্তুকের গলার স্বর শুনেও রতনবাবু চমকে উঠলেন। একবার তাঁর পাড়ার ছেলে সুশান্ত একটা টেপ-রেকর্ডারে রতনবাবুর গলা রেকর্ড করে শুনিয়েছিল। সে গলা আর এই লোকটির গলায় কোনও তফাত নেই বললেই চলে।

ভদ্রলোক বললেন, 'আমার নাম মণিলাল মজুমদার। আপনি তো বোধহয় নিউ মহামায়া হোটেলে উঠেছেন, তাই না?'

রতনলাল—মণিলাল। নামেও কেমন আশ্চর্য মিল। রতনবাবু কোনওরকমে অবাক ভাবটা কাটিয়ে তাঁর নিজের পরিচয়টা দিলেন।

আগন্তুক বললেন, 'আপনার বোধহয় আমাকে মনে পড়বে না—আমি কিন্তু এর আগেও আপনাকে দেখেছি।'

'কোথায় বলুন তো?'

'আপনি গত পুজোয় ধুলিয়ান যাননি?'

রতনবাবুর ভুরু কপালে তুলে বললেন, 'আপনিও সেখানে গেসলেন নাকি?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। আমি প্রতিবারই পুজোয় কোথাও না কোথাও যাই। একা মানুষ, বন্ধুবান্ধবও বিশেষ নেই। আর নতুন নতুন জায়গায় একা একা বেড়াতে দিব্যি লাগে। সিনির কথাটা আমার আপিসের এক সহকর্মী আমাকে বলেন। বেশ জায়গা—কী বলেন?'

রতনবাবু ঢোক গিলে মাথা নেড়ে সম্মতি জানালেন। কেমন যেন অবিশ্বাস আর অসোয়াস্তি মেশানো একটা ভাব বোধ করছেন তিনি।

'ওদিকের পুকুরটা দেখেছেন—যার পাশে পাখির জটলা হয় বিকেলবেলার দিকটা?' মণিলালবাবু জিজ্ঞেস করলেন।

রতনবাবু বললেন, হ্যাঁ, দেখেছেন।

'মনে হল কিছু ভিনদেশের পাখিও জড়ো হয়েছে ওখানে। কিছু পাখি দেখলাম যা বাংলাদেশে আগে দেখিনি। আপনার কী মনে হল?'

এতক্ষণে রতনবাবু খানিকটা স্বাভাবিক বোধ করছেন। বললেন, 'আমারও তাই ধারণা। আমিও কতকগুলো পাখি দেখে চিনতে পারিনি।'

দূর থেকে একটা গুম্ গুম্ শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। ট্রেন আসছে। পুব দিকে চেয়ে দেখলেন দূরে সার্চলাইট দেখা যাচ্ছে। আলোটা ক্রমশ বড় হয়ে এগিয়ে আসছে। রতনবাবু আর মণিলালবাবু দু'জনেই ব্রিজের রেলিং-এর ধারে গিয়ে দাঁড়ালেন। বিরাট শব্দ করে ব্রিজটাকে থরথর করে কাঁপিয়ে ট্রেনটা উলটো দিকে চলে গেল। দু'জন ভদ্রলোকই হেঁটে ব্রিজটার উলটোদিকে গিয়ে যতক্ষণ না ট্রেনটা অদৃশ্য হয় ততক্ষণ সেদিকে চেয়ে রইলেন। রতনবাবুর মনে ছেলেমানুষি রোমাঞ্চের ভাব জেগে উঠেছে। মণিলালবাবু বললেন, 'আশ্চর্য! এত বয়স হল, তবু ট্রেন দেখার আনন্দটা গেল না!'

বাড়ি ফেরার পথে রতনবাবু জানালেন যে, মণিলালবাবু তিনদিন হল সিনিতে এসেছেন, আর কালিকা হোটেলে উঠেছেন। কলকাতাতেই তাঁর পৈতৃক বাড়ি, কাজও করেন তিনি কলকাতার এক সওদাগরি আপিসে। মাইনের কথাটা কেউ কাউকে সাধারণত জিজ্ঞেস করে না, কিন্তু রতনবাবু একটা অদম্য ইচ্ছের ফলে লজ্জার মাথা খেয়ে সেটা জিজ্ঞেস করে ফেললেন। উত্তর যা পেলেন তাতে তাঁর কপালে ঘাম ছুটে গেল। এমনও কি সম্ভব? মণিলালবাবু আর রতনবাবুর মাইনে এক—দু'জনেই পান চারশো সাঁইত্রিশ টাকা, দু'জনেই ঠিক একই বোনাস পেয়েছেন পুজোয়।

লোকটা যে তাঁর নাড়িনক্ষত্র কোনও ফিকিরে আগে থেকেই জেনে নিয়ে তাঁর সঙ্গে একটা ধাপ্পাবাজির খেলা খেলছে, এ-কথাটা রতনবাবু কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারলেন না। প্রথমত, তাঁর রোজকার জীবনে কী ঘটনা না-ঘটছে তা নিয়ে কেউ কোনওদিন মাথা ঘামায়নি। তিনি নিজের তালে নিজেই ঘোরেন। আপিসের বাইরে বাড়ির চাকর ছাড়া কারুর সঙ্গে কথা বলেন না, কারুর বাড়িতে গিয়ে কখনও আড্ডা মারেন না। মাইনের ব্যাপারটা না হয় বাইরে জানাজানি হতে পারে, কিন্তু তিনি রাত্রে কখন ঘুমোন, কী খেতে ভালবাসেন, কোন খবরের কাগজটা পড়েন, কোন থিয়েটার বা কোন বাংলা সিনেমা তিনি ইদানীং দেখেছেন—এসব তো তিনি নিজে ছাড়া আর কেউই জানে না। অথচ এর সবকিছুই যে ভদ্রলোকের সঙ্গে হুবহু মিলে যাচ্ছে!

রতনবাবু কিন্তু কথাটা মুখ ফুটে মণিলালবাবুকে বলতে পারলেন না। সারা রাস্তা তিনি শুধু মণিলালবাবুর কথাই শুনলেন, আর নিজের সঙ্গে মিল দেখে বারবার অবাক হলেন, চমকে উঠলেন। নিজের সম্বন্ধে তিনি এগিয়ে গিয়ে কিছুই বললেন না।

রতনবাবুর হোটেলটাই আগে পড়ে। হোটেলের সামনে এসে মণিলালবাবু বললেন, 'আপনার এখানে খাওয়া-দাওয়া কেমন?'

রতনবাবু বললেন, 'মাছের ঝোলটা মন্দ করে না। বাকি সব চলনসই।'

'আমার হোটেলে রান্নাটা আবার তেমন সুবিধের নয়। শুনেছি এখানে জগন্নাথ মিষ্টান্ন ভাণ্ডারে নাকি ভাল লুচি আর ছোলার ডাল করে। আজ রাতের খাওয়াটা সেখানে সারলে কেমন হয়?'

রতনবাবু বললেন, 'বেশ তো, আমার আপত্তি নেই। ধরুন এই আটটা নাগাদ?'

'ঠিক আছে। আমি ওয়েট করব আপনার জন্য। তারপর একসঙ্গে যাওয়া যাবে।'

মণিলালবাবু চলে যাবার পর রতনবাবু হোটেলে না ঢুকে কিছুক্ষণ বাইরে রাস্তায় পায়চারি করলেন। সন্ধ্যা গাঢ় হয়ে এসেছে। আকাশ পরিষ্কার—এতই পরিষ্কার যে, তারার মধ্যে দিয়ে এঁকেবেঁকে যাওয়া ছায়াপথটাকে পর্যন্ত পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। আশ্চর্য! এতকাল রতনবাবুর আফসোস ছিল যে তাঁর সঙ্গে মনের আর মতের মিল হয় এমন কোনও বন্ধু তিনি খুঁজে পাননি; অথচ এই সিনিতে এসে হঠাৎ এমন একজন লোকের সাক্ষাৎ পেয়েছেন যাকে তাঁরই একটি ডুপ্লিকেট সংস্করণ বলা যেতে পারে। চেহারায় খানিকটা তফাত থাকলেও, স্বভাবে আর রুচিতে এমন মিল যমজ ভাইদের মধ্যেও দেখা যায় কিনা সন্দেহ।

তার মানে কি এতদিনে তাঁর বন্ধুর অভাব মিটল?

রতনবাবু এ প্রশ্নের উত্তর চট করে খুঁজে পেলেন না। হয়তো মণিলালবাবুর সঙ্গো আরেকটু মিশলে তিনি ব্যাপারটা বুঝতে পারবেন। একটা জিনিস তিনি বেশ বুঝতে পারছিলেন যে, তাঁর একা ভাবটা যেন কেটে গেছে। এ পৃথিবীতে ঠিক তাঁরই মতো আরেকটি লোক এতদিন ছিল, আর তিনি আকস্মিকভাবে তার সাক্ষাৎ পেয়ে গেছেন।

জগন্নাথ মিষ্টান্ন ভাণ্ডারে টেবিলের দু'দিকে মুখোমুখি বসে খেতে খেতে রতনবাবু লক্ষ্য করলেন যে, তাঁরই মতো মণিলালবাবুও বেশ পরিষ্কার করে চেটেপুটে খেতে ভালবাসেন, তাঁরই মতো খাবার মাঝখানে জল খান না, তাঁরই মতো ডালের মধ্যে পাতিলেবু কচলে নেন। সব খাবার পরে দই না খেলে রতনবাবুর চলে না, মণিলালবাবুরও না।

খাবার সময় রতনবাবুর একটু অসোয়াস্তি লাগছিল এই কারণে যে, তাঁর সবসময়ই মনে হচ্ছিল যে, অন্য টেবিলের লোকেরা তাঁদের দিকে ফিরে ফিরে দেখছে। এরা কি তাঁদের দু'জনের মধ্যে মিলটা লক্ষ্য করেছে? এই মিলটা কি এতই স্পষ্ট যে, বাইরের লোকের চোখেও ধরা পড়ে?

খাবার পরে রতনবাবু আর মণিলালবাবু চাঁদনি রাতে রাস্তায় কিছুক্ষণ পায়চারি করলেন। একটা প্রশ্ন রতনবাবুর মাথায় অনেকক্ষণ থেকে ঘুরছিল, এক ফাঁকে সেটা বেরিয়ে পড়ল। জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনার কি পঞ্চাশ পেরিয়ে গেছে?'

মণিলালবাবু হেসে বললেন, 'এই পেরোলো বলে। এগারোই পৌষে পঞ্চাশ কমপ্লিট করব।'

রতনবাবুর মাথাটা বোঁ করে ঘুরে গেল। দু'জনের জন্মও একই দিনে—১৩২৩ সালের এগারোই পৌষ!

আধঘণ্টাখানেক পায়চারি করার পর বিদায় নেবার সময় মণিলালবাবু হেসে বললেন, 'আপনার সঙ্গো আলাপ করে বড় আনন্দ পেলুম। আমার সঙ্গো সহজে কারুর একটা বনে না—কিন্তু আপনার বেলা সে-কথাটা খাটে না। বাকি ছুটিটা বেশ আনন্দে কাটবে বলে মনে হচ্ছে।'

অন্যান্য দিন রতনবাবু দশটার মধ্যে ঘুমিয়ে পড়েন। সঙ্গো দু-একটি বাংলা মাসিক পত্রিকা নিয়ে বিছানায় শুয়ে কিছুক্ষণ পাতা ওলটানোর পর আপনা থেকেই ঘুমে চোখ বুজে আসে। শোয়া অবস্থাতেই হাত বাড়িয়ে বাতির সুইচটা পাওয়া যায়, সেটা নেভানোর মিনিটখানেকের মধ্যেই রতনবাবুর নাক ডাকতে শুরু করে। আজ কিন্তু তিনি দেখলেন যে, তাঁর ঘুম আসতে চাইছে না। পড়বারও ইচ্ছে নেই। পত্রিকাটা হাতে তুলে নিয়ে আবার পাশের টেবিলে রেখে দিলেন।

মণিলাল মজুমদার.....

রতনবাবু কোথায় যেন পড়েছিলেন যে, পৃথিবীর কোটি কোটি মানুষের মধ্যে কোথাও এমন কোনও দু'জনকে পাওয়া যাবে না যাদের চেহারা হুবহু একরকম। অথচ চোখ-কান-নাক-হাত-পা ইত্যাদির সংখ্যা সকলেরই এক। চেহারার হুবহু মিল না হয় অসম্ভব, কিন্তু দু'জনের মনের এক আশ্চর্য মিল কি সম্ভব? শুধু মন কেন— বয়স, পেশা, গলার স্বর, হাঁটা ও বসার ভঙ্গি, চোখের চশমার পাওয়ার ইত্যাদি আরও অনেক কিছু হুবহু মিলে যাচ্ছে। ভাবলে মনে হয় অসম্ভব ব্যাপার, কিন্তু সেটাও যে সম্ভব হয়েছে তার প্রমাণ তো গত চার ঘণ্টায় রতনবাবু অনেকবার পেয়েছেন।

রাত বারোটা নাগাদ রতনবাবু বিছানা ছেড়ে উঠে ঘরের কুঁজো কাত করে আঁজলা করে খানিকটা জল নিয়ে নিজের মাথায় দিলেন। তাঁর মাথা গরম হয়ে গেছে। এ অবস্থায় ঘুম আসবে না। ভিজে মাথায় আলতো করে গামছাটা একবার বুলিয়ে নিয়ে আবার বিছানায় গিয়ে শুলেন। বালিশটা ভিজে গেল। ভালই। যতক্ষণ না শুকোয় ততক্ষণ মাথা ঠাণ্ডা থাকবে।

পাড়া নিস্তব্ধ হয়ে গেছে। একটা প্যাঁচা বিকট স্বরে চ্যাঁচাতে চ্যাঁচাতে হোটেলের পাশ দিয়ে উড়ে চলে গেল। জানলা দিয়ে চাঁদের আলো এসে বিছানায় পড়েছে। কখন জানি আপনা থেকেই রতনবাবুর মন থেকে ভাবনা মুছে গিয়ে তাঁর চোখ দুটো বন্ধ হয়ে গেল।

রাত্রে ঘুমোতে দেরি হবার ফলে রতনবাবুর সকালে ঘুম ভাঙতে প্রায় আটটা হয়ে গেল। ন'টায় মণিলালবাবুর আসার কথা। আজ মঙ্গলবার। মাইলখানেক দূরে একটা জায়গায় আজ হাট বসবে। গতকাল খেতে খেতে দু'জনে প্রায় একসঙ্গেই হাটে যাবার ইচ্ছে প্রকাশ করেন। কেনার বিশেষ কিছু নেই, খালি ঘুরে দেখা আর কি।

চা খেতে খেতেই প্রায় ন'টা বাজল। সামনে প্লেটে রাখা মৌরির খানিকটা মুখে পুরে হোটেল থেকে বাইরে বেরোতেই রতনবাবু দেখলেন মণিলালবাবু হাসিমুখে এগিয়ে আসছেন।

কাছে এসে মণিলালবাবুর প্রথম কথা এল, 'আপনার সঙ্গে কী আশ্চর্য মিল সে-কথা ভাবতে ভাবতে কাল ঘুমোতে অনেক রাত হয়ে গেল। উঠে দেখি আটটা বাজতে পাঁচ। এমনিতে ঠিক ছ'টায় উঠি।'

রতনবাবু এ-কথার কোনও জবাব দিলেন না। দু'জনে হাটের দিকে রওনা দিলেন। পাড়ার কতকগুলো ছোকরা জটলা করছিল; রতনবাবুরা তাদের সামনে দিয়ে যাবার সময় তাদের মধ্যে একজন টিটকিরির সুরে বলে উঠল, 'মানিকজোড়!' রতনবাবু যথাসম্ভব কথাটাকে অগ্রাহ্য করে এগিয়ে চললেন। মিনিট কুড়ির মধ্যে দু'জনে হাটে পৌঁছে গেলেন।

বেশ গমগমে হাট। ফলমূল, শাকসবজি, তরিতরকারি থেকে বাসনকোসন, হাঁড়িকুঁড়ি, জামাকাপড়, মুরগিছাগল ইত্যাদি সবকিছুরই দোকান বসেছে। ভিড়ও হয়েছে বেশ। সেই ভিড়ের মধ্যে দিয়ে এ-দোকান-সে-দোকান দেখতে দেখতে রতনবাবু আর মণিলালবাবু এগিয়ে চললেন।

ওটা কে? পঞ্চা না? রতনবাবু কেন জানি তাঁর হোটেলের চাকরটাকে সামনে ভিড়ের মধ্যে দেখে তাঁর দৃষ্টি নামিয়ে মুখটাকে আড়াল করে দিলেন। ছোকরাদের 'মানিকজোড়' কথাটা কানে যাওয়া অবধি তাঁর ধারণা হয়েছে তাঁদের দু'জনকে একসঙ্গে দেখে লোকেরা মনে মনে হাসে।

ভিড়ের মধ্যে দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে প্রায় আচমকা রতনবাবুর মনে একটা চিন্তার উদয় হল। হঠাৎ কেন জানি মনে হল যে, তিনি একাই ছিলেন ভাল। বন্ধুর তাঁর কোনও দরকার নেই। আর বন্ধু হলেও, সে লোক যেন মণিলালবাবুর মতো না হলেই ভাল। মণিলালবাবুর সঙ্গে তিনি যতবারই কথা বলেছেন, ততবারই তাঁর মনে হয়েছে তিনি যেন নিজের সঙ্গে কথা বলছেন। প্রশ্ন করলে কী উত্তর পাওয়া যাবে সেটা যেন আগে থেকেই জানা, তর্ক করার কোনও সুযোগ নেই, আলোচনার প্রয়োজন নেই, ঝগড়াঝাঁটির কোনও সম্ভাবনাই নেই। এটা কি বন্ধুত্বের লক্ষণ? তাঁর অফিসের কার্তিক রায়ের সঙ্গে মুকুন্দ চক্কোত্তির তো গলায় গলায় ভাব; কিন্তু তা বলে কি দু'জনের মধ্যে কথা কাটাকাটি হয় না? আলবত হয়। কিন্তু তবু তো তারা বন্ধু, সত্যি করেই বন্ধু।

সবকিছু মিলিয়ে তাঁর বারবার মনে হতে লাগল যে মণিলাল মজুমদার লোকটি তাঁর জীবনে না এলেই যেন ভাল ছিল। ঠিক একই রকম দু'জন লোক যদি জগতে থাকেও, তাদের পরস্পরের কাছাকাছি আসাটা কোনও কাজের কথা নয়। সিনি থেকে কলকাতা ফিরে গিয়েও মণিলালবাবুর সঙ্গে হয়তো দেখা হয়ে যেতে পারে এ-কথা ভাবতেই রতনবাবু শিউরে উঠলেন।

একটা দোকানে বাঁশের লাঠি বিক্রি হচ্ছিল। রতনবাবুর অনেকদিনের শখ একটা লাঠি কেনার, কিন্তু মণিলালবাবু দর করছেন দেখে রতনবাবু অনেক কষ্টে তাঁর লোভ সংবরণ করলেন। শেষটায় দেখেন কি মণিলালবাবু নিজেই একটার জায়গায় দুটো লাঠি কিনে তার একটি তাঁকে উপহার দিলেন। দেবার সময় আবার বললেন, 'এই সামান্য লাঠিটা বন্ধুত্বের চিহ্ন হিসাবে নিতে আপনার নিশ্চয়ই আপত্তি হবে না।'

হাটের পর হোটেলের দিকে ফেরার পথে মণিলালবাবু অনেক কথা বললেন। তাঁর ছেলেবেলার কথা, তাঁর মা-বাবার কথা, তাঁর ইস্কুল কলেজের কথা। রতনবাবুর শুনতে শুনতে মনে হচ্ছিল যে, তাঁর নিজের জীবনকথাই যেন কেউ তাঁকে গড়গড় করে শুনিয়ে যাচ্ছে।

বিকেলবেলা চা খেয়ে দু'জনে মাঠের মাঝখানের পথ দিয়ে ব্রিজের দিকে হাঁটতে-হাঁটতে রতনবাবুর মাথায় ফন্দিটা এল। কথা তাঁকে বেশি বলতে হচ্ছে না, তাই মাথাটা কাজ করছিল ভাল। দুপুর থেকেই মনে হচ্ছে এই লোকটাকে হটাতে পারলে ভাল হয়, কিন্তু উপায়টা মাথায় আসছিল না। ঠিক এই মুহূর্তে পশ্চিমের আকাশে কালো মেঘটা চোখে পড়তেই রতনবাবু উপায়টা যে তাঁর চোখের সামনে জ্বলজ্যান্ত দৃশ্য হিসাবে দেখতে পেলেন।

তিনি দেখলেন যে, তাঁরা দু'জন যেন ওভারব্রিজের রেলিং-এর ধারটায় দাঁড়িয়ে আছেন। দূরে পশ্চিম দিক থেকে ছ'টার মেল ট্রেনটা ঝড়ের মতো এগিয়ে আসছে। এঞ্জিনটা যখন বিশ গজের মধ্যে এসে পড়েছে, তখন তিনি মণিলালবাবুর কাঁধে প্রচণ্ড ধাক্কা দিয়ে—

রতনবাবু হাঁটা অবস্থাতেই চোখ বন্ধ করলেন! তারপর চোখ খুলে আড়চোখে একবার মণিলালবাবুর দিকে দেখে নিলেন। মণিলালবাবুকে কিছুমাত্র চিন্তিত বলে মনে হল না। কিন্তু দু'জনের মধ্যে যদি এতই মিল হয়, তা হলে মণিলালবাবুও হয়তো মনে মনে তাঁকে হটাবার কোনও ফন্দি আঁটছেন!

কিন্তু তাঁর চেহারা দেখে তা মনে হল না। সত্যি বলতে কি, ভদ্রলোক দিব্যি মনের আনন্দে গুন্‌গুন্‌ করে গান গাইছেন। হিন্দি সিনেমার এই গানের সুরটা রতনবাবুও মাঝে মাঝে গুন্‌গুন্‌ করে থাকেন।

পশ্চিমের কালো মেঘটা এগিয়ে এসেছে, সূর্য মেঘের পিছনে ঢাকা। বোধহয় আর কয়েক মিনিটেই অস্ত যাবে। রতনবাবু চারিদিকে চেয়ে ত্রিসীমানায় আর অন্য

কোনও মানুষের চিহ্ন দেখতে পেলেন না। ভালই হয়েছে। কাছাকাছির মধ্যে কোনও তৃতীয় ব্যক্তি থাকলে তাঁর প্ল্যান ভেস্তে যেত।

আশ্চর্য—একটা মানুষকে খুন করার কথা ভেবেও রতনবাবু নিজেকে দোষী মনে করতে পারলেন না। মণিলালবাবুর যদি কোনও বিশেষত্ব থাকত—এমনকী তাঁর স্বভাবচরিত্র যদি রতনবাবুর চেয়ে সামান্য অন্যরকমও হত—তা হলে রতনবাবু তাঁকে মারবার কথা কল্পনাই করতে পারতেন না। রতনবাবুর বিশ্বাস হয়েছে যে, একই রকম দু'জন লোকের একসঙ্গে বেঁচে থাকার কোনও সার্থকতা নেই। তিনি নিজে আছেন, নিজে থাকবেন এটাই যথেষ্ট! মণিলালবাবু থেকেও যদি তাঁর থেকে দূরে থাকতে পারতেন—যেমন এই কিছুদিন আগে পর্যন্ত ছিলেন—তাতে তাঁর আপত্তি করার কিছু ছিল না। কিন্তু এখন এই আলাপের পর সেটা সম্ভব নয়, তাই তাঁকে সরিয়ে ফেলা নেহাতই দরকার।

দুই ভদ্রলোক এসে ওভারব্রিজটায় পৌঁছলেন।

'বেশ গুমোট করেছে', মণিলালবাবু বললেন। 'রাত্রের দিকে বৃষ্টিও হতে পারে। আর তার মানেই কাল থেকে জাঁকিয়ে ঠাণ্ডা পড়বে।'

রতনবাবু এই ফাঁকে একবার ঘড়িটা দেখে নিলেন। ছ'টা বাজতে বারো মিনিট। ট্রেনটা নাকি খুব টাইমে যাতায়াত করে। আর বেশিক্ষণ নেই। রতনবাবু তাঁর জড় ভাবটা ঢাকবার জন্য একটা হাই তুলে বললেন, 'বৃষ্টি হলেও ঘণ্টা চার-পাঁচের আগে কোনও সম্ভাবনা আছে বলে মনে হয় না।'

'সুপুরি খাবেন?'

মণিলালবাবু পকেট থেকে একটা গোল টিনের কৌটো বার করে ঢাকনা খুলে রতনবাবুর দিকে এগিয়ে দিলেন। রতনবাবুর পকেটেও একটা কৌটোতে সুপুরি ছিল। তিনি সেটা আর বার না করে, সেটার কথা উল্লেখও না করে মণিলালবাবুর কৌটো থেকে একটা সুপুরি নিয়ে মুখে পুরে দিলেন।

আর প্রায় সেই মুহূর্তেই ট্রেনের আওয়াজটা শোনা গেল।

আজ ট্রেনটা ছ'টার একটু আগেই চলে এসেছে।

মণিলালবাবু রেলিং-এর দিকে এগিয়ে গিয়ে ঘড়িটা একবার দেখে নিয়ে বললেন, 'সাত মিনিট বিফোর টাইম।'

পশ্চিমে মেঘ থাকার জন্য আজ অন্যদিনের চেয়ে চারিদিক একটু বেশি অন্ধকার, তাই হেডলাইটের আলোটা আরও বেশি উজ্জ্বল বলে মনে হচ্ছে। এখনও অনেক দূরে ট্রেন, তবে আলোটা দ্রুত বেড়ে চলেছে। একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকলে চোখে জল এসে যায়।

'ক্রিং ক্রিং।'

সাইকেল চেপে একটা লোক রাস্তা দিয়ে ব্রিজের দিকে এসেছে। সর্বনাশ! লোকটা থামবে নাকি?

না, রতনবাবুর আশঙ্কা ভুল। লোকটা তাঁদের পাশ দিয়ে ঝড়ের বেগে সাইকেল চালিয়ে উলটোদিকের রাস্তা দিয়ে সন্ধ্যার অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেল।

ট্রেনটা প্রচণ্ড দাপটে এগিয়ে এসেছে। চোখ-ঝলসানো হেডলাইটে দূরত্ব আন্দাজ করা কঠিন। আর কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই ওভারব্রিজ কাঁপতে শুরু করবে।

ট্রেনের শব্দে কান পাতা যায় না।

মণিলালবাবু রেলিং-এর ধারে দাঁড়িয়ে ট্রেনের দিকে চেয়ে আছেন। একটা বিদ্যুতের চমক—আর সেই সঙ্গো সঙ্গো রতনবাবু তাঁর সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করে দু'হাত দিয়ে মণিলালবাবুর পিঠে মারলেন ধাক্কা। তার ফলে মণিলালবাবুর দেহটা দু'হাত উঁচু কাঠের রেলিং-এর উপর দিয়ে উলটে সটান চলে গেল নীচে একেবারে রেললাইনের দিকে। ঠিক সেই মুহূর্তেই রতনবাবু বুঝতে পারলেন যে, ওভারব্রিজটা কাঁপতে শুরু করে দিয়েছে।

রতনবাবু আজ আর ট্রেন চলে যাবার দৃশ্য দেখার জন্য অপেক্ষা করলেন না। কাঠের ব্রিজটার মতোই তাঁর মধ্যেও একটা কাঁপুনি শুরু হয়েছে। পশ্চিমের মেঘটা অনেকখানি এগিয়ে এসেছে—আর মাঝে মাঝে বিদ্যুতের চমক।

রতনবাবু র‍্যাপারটা বেশ ভালভাবে গায়ে জড়িয়ে নিয়ে হোটেলের দিকে রওনা দিলেন।

বৃষ্টির প্রথম পশলাটা এড়াবার ব্যর্থ চেষ্টায় শেষের রাস্তাটুকু প্রায় দৌড়ে হাঁপাতে-হাঁপাতে এসে রতনবাবু হোটেলে ঢুকলেন।

ঢুকেই তাঁর কেমন যেন খটকা লাগল।

এটা কোথায় এলেন তিনি? মহামায়া হোটেলের সামনে ঘরটা তো এরকম নয়। এরকম টেবিল, এরকমভাবে চেয়ার সাজানো, দেয়ালে এরকম ছবি.....।

এদিক-ওদিক দেখতে হঠাৎ দেয়ালে একটা কাঠের বোর্ড তাঁর চোখে পড়ল। কী বিদঘুটে ভুল রে বাবা! এ যে কালিকা হোটেলে এসে ঢুকেছেন তিনি! এইখানেই তো মণিলালবাবু ছিলেন না?

'বৃষ্টিতে ভিজলেন নাকি?'

কে একজন প্রশ্ন করল তাঁকে। রতনবাবু ঘুরে দেখলেন মাথায় কোঁকড়া চুল সবুজ র‍্যাপার গায়ে দেওয়া একজন লোক—বোধহয় এই হোটেলেরই বাসিন্দা—তাঁর দিকে মুখ করে হাতে চায়ের পেয়ালা নিয়ে বসে আছে। রতনবাবুর মুখ দেখে ভদ্রলোক যেন একটু অপ্রস্তুত হয়ে বললেন, 'সরি—ভুল হয়ে গেছে। আপনাকে দেখে হঠাৎ মণিলালবাবু বলে মনে হয়েছিল!'

এই প্রশ্নটা শুনে এই প্রথম রতনবাবুর মনে একটা সন্দেহ জাগল—তিনি যে

খুনটা করলেন—সেটা সবদিক বিচার করে আটঘাট বেঁধে করেছেন কি? তাঁরা দু'জন যে একসঙ্গো বেরিয়েছেন সেটা হয়তো অনেকেই দেখেছে; কিন্তু দেখা মানেই কি লক্ষ্য করা? যারা দেখেছে তাদের কি কথাটা মনে থাকবে? আর যদি থাকেও, তার মানেই কি সন্দেহটা তাঁর উপরেই পড়বে? হাট থেকে বেরিয়ে খোলা রাস্তায় পড়বার পর আর তাঁদের কেউ দেখেনি—এ কথা রতনবাবু খুব ভালভাবেই জানেন। আর ওভারব্রিজে পৌঁছনোর পর—ও হ্যাঁ—সেই সাইকেলওয়ালা তো তাঁদের দুজনকে নিশ্চয়ই দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছে। কিন্তু তখন রীতিমতো অন্ধকার হয়ে এসেছে। ওইভাবে দ্রুতবেগে সাইকেল চালিয়ে যাবার সময় কি সে লোক তাঁদের মুখ চিনে মনে করে রেখে দিয়েছে? অসম্ভব!

রতনবাবু যতই ভাবলেন, ততই তিনি নিশ্চিন্ত বোধ করতে লাগলেন। মণিলালবাবুর মৃতদেহ আবিষ্কার হবে নিশ্চয়ই। কিন্তু তার ফলে রতনবাবুর উপর সন্দেহ পড়বে, তাঁর বিচার হবে, শাস্তি হবে, তাঁকে খুনি হিসেবে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হতে হবে—এসব কথা রতনবাবুর কিছুতেই বিশ্বাস হল না।

বাইরে বৃষ্টি হচ্ছে দেখে রতনবাবু কালিকা হোটেলে বসে এক পেয়ালা চা খেলেন। সাড়ে সাতটা নাগাদ বৃষ্টি থামল। রতনবাবু সটান নিউ মহামায়ায় চলে এলেন। কী অদ্ভুতভাবে ভুল করে তিনি ভুল হোটেলে গিয়ে হাজির হয়েছিলেন সেটা ভাবতেও তাঁর হাসি পাচ্ছিল।

রাত্রে পেটভরে খেয়ে বিছানায় শুয়ে 'দেশ' পত্রিকা খুলে অস্ট্রেলিয়ার বুনো জাতিদের সম্বন্ধে একটা প্রবন্ধ পড়ে রতনবাবু ঘরের বাতি নিভিয়ে দিয়ে পরম নিশ্চিন্তে চোখ বুজলেন। আবার তিনি একা এবং অদ্বিতীয়। তাঁর সঙ্গী নেই, সঙ্গীর কোনও প্রয়োজনও নেই। তিনি এতকাল যেমনভাবে কাটিয়েছেন, আবার ঠিক তেমনিভাবেই কাটাবেন। এর চেয়ে আরাম আর কী হতে পারে?

বাইরে আবার বৃষ্টি শুরু হয়েছে। আর তার সঙ্গো বিদ্যুতের চমক আর মেঘের গর্জন। কিন্তু তাতে কিছু এসে যায় না, কারণ রতনবাবুর নাক ডাকতে শুরু করেছে।

পরদিন সকালে চা দেবার সময় পঞ্চা বলল, 'ওই লাঠিটা কাল হাটে কিনলেন নাকি বাবু?'

রতনবাবু বলেন, 'হ্যাঁ।'

'কত নিল?'

রতনবাবু দাম বললেন। তারপর গলার স্বর যথাসম্ভব স্বভাবিক করে বললেন, 'তুমি গিয়েছিলে হাটে?'

পঞ্চা একগাল হেসে বলল, 'হ্যাঁ বাবু। দ্যাখলাম তো আপনাকে। আপনি আমায় দেখতে পাননি?'

'কই, না তো।'

এর পরে পঞ্চার সঙ্গো তাঁর আর কোনও কথা হয়নি।

চা খাওয়া শেষ করে হোটেল থেকে বেরিয়ে হাঁটতে হাঁটতে তিনি কালিকা হোটেলের সামনে এসে পৌঁছলেন। কালকের সেই কোঁকড়া চুলওয়ালা ভদ্রলোকটি আরও কয়েকজন বাঙালি ভদ্রলোকের সঙ্গো দরজার গোড়ায় দাঁড়িয়ে চিন্তিতভাবে কথাবার্তা বলছেন। মণিলালবাবুর নাম, আর 'সুইসাইড' কথাটা রতনবাবুর কানে এল। তিনি ভাল করে শোনার জন্য আরেকটু এগিয়ে গেলেন। শুধু তাই না—একটা প্রশ্নও করে বসলেন।

"কে আত্মহত্যা করল মশাই?'

গতকালের ভদ্রলোক বললেন, 'কাল আপনাকে দেখে যে লোক বলে ভুল করেছিলুম, তিনি।'

'সুইসাইড?'

'সেইরকমই তো মনে হচ্ছে। রেললাইনের ধারে লাশ পাওয়া গেছে। একটা ওভারব্রিজ আছে, তারই ঠিক নীচে। মনে হয় উপর থেকে লাফিয়ে পড়েছিলেন। ভদ্রলোক এমনিতেই একটু অদ্ভুত গোছের ছিলেন। কারুর সঙ্গো বিশেষ কথাবার্তা বলতেন না। আমরা ওঁকে নিয়ে বলাবলি করতুম।'

'ডেডবডি—?'

'পুলিশের জিম্মায়। চেঞ্জে এসেছিলেন ভদ্রলোক। চেনাশুনা কেউ নেই এখানে। কলকাতা থেকে এসেছিলেন। এর বেশি আর কিছুই নাকি জানা যায়নি।'

রতনবাবু সহানুভূতির ভঙ্গিতে বার দুয়েক মাথা নেড়ে চুক চুক করে শব্দ করে আবার হাঁটতে শুরু করলেন।

সুইসাইড! তা হলে খুনের কথাটা কারুর মাথাতেই আসেনি। কী আশ্চর্য সৌভাগ্য তাঁর। খুন জিনিসটা তো তা হলে ভারী সহজ! লোকে এত ভয় পায় কেন?

রতনবাবু মনে মনে ভারী হালকা বোধ করলেন। দু'দিন পরে আজ তিনি আবার একা বেড়াতে পারবেন। ভাবতেও আনন্দ লাগে।

গতকাল মণিলালবাবুকে ঠেলা দেবার সময়ই বোধহয় রতনবাবুর শার্টের একটা বোতাম ছিঁড়ে গিয়েছিল। একটা দরজির দোকান খুঁজে বার করে তিনি বোতামটা লাগিয়ে নিলেন। তারপর একটা মনিহারি দোকান থেকে একটা নিম টুথপেস্ট কিনলেন—নাহলে কাল সকালে দাঁত মাজা হবে না। যেটা রয়েছে সেটা টিপে টিপে একবারে চ্যাপটার শেষ অবস্থায় এসে পৌঁছেছে।

দোকান থেকে বেরিয়ে এসে কিছুদূর যেতেই একটা বাড়ির ভিতর থেকে কীর্তনের আওয়াজ এল রতনবাবুর কানে। রতনবাবু খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সেই কীর্তন শুনলেন। তারপর শহরের বাইরে একটা নতুন রাস্তা দিয়ে মাইলখানেক হেঁটে এগারোটা নাগাদ হোটেলে ফিরে এসে স্নান খাওয়া সেরে দিবানিদ্রার উদ্যোগ করলেন।

যাথারীতি তিনটে নাগাদ ঘুম ভাঙল, আর ভাঙামাত্র রতনবাবু বুঝতে পারলেন যে তাঁর মন চাইছে আজ সন্ধ্যায় আরেকবার ওভারব্রিজটায় যেতে। গতকাল খুব স্বাভাবিক কারণেই রতনবাবু ট্রেনের দৃশ্যটা উপভোগ করতে পারেননি। আকাশে মেঘ অবিশ্যি কাটেনি, কিন্তু তাতে ক্ষতি নেই। বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা আছে বলে মনে হয় না। আজ তিনি ট্রেন আসা থেকে শুরু করে চলে যাবার শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আরাম করে দেখবেন।

পাঁচটার সময় চা খেয়ে রতনবাবু নীচে নামলেন। সামনেই ম্যানেজার শম্ভুবাবু বসে আছেন। রতনবাবুকে দেখে বললেন, 'যে ভদ্রলোকটি কাল মারা গেছেন তাঁর সঙ্গে আপনার আলাপ ছিল নাকি মশাই?'

রতনবাবু প্রথমটা কিছু না বলে অবাক হবার ভান করে শম্ভুবাবুর দিকে চাইলেন। তারপর বলেন, 'কেন বলুন তো?'

'না—ইয়ে—মানে, পঞ্চা বলছিল হাটে আপনাদের দু'জনকে একসঙ্গে দেখেছে!'

রতনবাবু অল্প হেসে শান্তভাবে বললেন, 'আলাপ আমার এখানে কারুর সঙ্গেই হয়নি। হাটে এক-আধজনের সঙ্গে কথা হয়েছে বটে, তবে কি জানেন—কোন লোকটি যে মারা গেছেন সেটাই তো আমি জানি না।'

'ও হো!' শম্ভুবাবু হাসলেন। ভদ্রলোক বেশ আমুদে। 'উনিও আপনারই মতো হাওয়া বদলাতে এসেছিলেন। কালিকা হোটেলে উঠেছিলেন।'

'ও, তাই বুঝি!'

রতনবাবু আর কোনও কথা না বলে বেরিয়ে পড়লেন। প্রায় দু'মাইল পথ, আর বেশি দেরি করলে ট্রেন দেখা যাবে না।

রাস্তায় তাঁর দিকে আর কেউ সন্দিগ্ধ দৃষ্টি দিল না। গতকাল যে ছেলেগুলো জটলা করছিল, তাদের কাউকেই আজ আর দেখা গেল না। ওই 'মানিকজোড়' কথাটা রতনবাবুর ভাল লাগেনি। ছেলেগুলো কোথায় গেল? একটা ঢাকের আওয়াজ শুনতে পাচ্ছেন রতনবাবু। পাড়ায় পুজো আছে। ছেলেগুলো নির্ঘাত সেখানেই গেছে। রতনবাবু নিশ্চিন্ত মনে এগিয়ে চললেন।

খোলা প্রান্তরের মাঝখানের পথে আজ তিনি একা। মণিলালবাবুর সঙ্গে আলাপ হবার আগেও তিনি নিশ্চিন্ত মানুষ ছিলেন, কিন্তু আজ তাঁর নিজেকে যেমন হালকা মনে হচ্ছে, তেমন হালকা এর আগে কখনও মনে হয়নি।

ওই যে বাবলা গাছ। ওটা পেরিয়ে মিনিটখানেক হাঁটলেই ওভারব্রিজ। আকাশ মেঘে ভরা, তবে ঘন কালো মেঘ নয়, ছাইয়ের মতো ফিকে মেঘ। বাতাস নেই, তাই সমস্ত মেঘ যেন এক জায়গায় স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

ওভারব্রিজটা দেখতে পেয়ে রতনবাবুর মন আনন্দে নেচে উঠল। তিনি পা চালিয়ে এগিয়ে গেলেন। বলা যায় না—ট্রেন যদি কালকের চেয়েও বেশি তাড়াতাড়ি এসে পড়ে! মাথার উপর দিয়ে একঝাঁক বক উড়ে গেল। ভিনদেশের বক কিনা কে জানে!

ব্রিজের উপর দাঁড়িয়ে সন্ধ্যার নিস্তব্ধতাটা রতনবাবু বেশ ভাল করে বুঝতে পারলেন। খুব মন দিয়ে কান পাতলে ক্ষীণ ঢাকের শব্দ শহরের দিক থেকে শোনা যায়। এ ছাড়া আর কোনও শব্দ নেই।

রতনবাবু রেলিং-এর পাশটায় গিয়ে দাঁড়ালেন। ওই যে দূরে সিগন্যাল, আর ওই যে আরও দূরে স্টেশন। রেলিং-এর নীচের দিকে কাঠের ফাটলে কী যেন একটা জিনিস চকচক্ করছে। রতনবাবু উপুড় হয়ে হাত বাড়িয়ে জিনিসটাকে বার করে আনলেন। সেটা একটা গোল টিনের কৌটো, তার ভিতরে এলাচ আর সুপুরি। রতনবাবু একটু হেসে সেটাকে ব্রিজের উপর থেকে নীচের লাইনে ফেলে দিলেন। ঠুং করে একটা মৃদু শব্দও পেলেন তিনি। কদ্দিন ওইখানে পড়ে থাকবে ওই সুপুরির কৌটো কে জানে!

কীসের আলো ওটা?

ট্রেন আসছে। এখনও শব্দ পাওয়া যাচ্ছে না। কিন্তু আলো এগিয়ে আসছে।

রতনবাবু অবাক হয়ে আলোটা দেখতে লাগলেন। হঠাৎ একটা দমকা বাতাসে তাঁর কাঁধ থেকে র‍্যাপারটা খসে পড়ল। রতনবাবু সেটাকে আবার বেশ ভাল করে জড়িয়ে নিলেন।

এবারে শব্দ পাচ্ছেন তিনি। গুড় গুড় গুড় গুম গুম গুম গুম গুম—যেন একটা ঝড় এগিয়ে আসছে, আর সঙ্গে ক্রমাগত একটা মেঘের গর্জন।

রতনবাবুর হঠাৎ মনে হল তাঁর পিছনে কে যেন এসে দাঁড়িয়েছে। এ সময় ট্রেনের দিক থেকে চোখ ফেরানো মুশকিল—কিন্তু তাও তিনি একবার চারিদিক চট করে চোখ ঘুরিয়ে দেখে নিলেন। কেউ কোথাও নেই। আজ কালকের চেয়ে অন্ধকার কম, তাই দেখতে অসুবিধে নেই। শুধু তিনি আর ওই দ্রুত ধাবমান জাঁদরেল ট্রেনটা ছাড়া মাইলখানেকের মধ্যে আর কেউ আছে বলে মনে হয় না।

ট্রেন এখন একশো গজের মধ্যে। রতনবাবু রেলিং-এর দিকে আরও এগিয়ে গেলেন। আগেকার দিনের স্টিম এঞ্জিন হলে এতটা এগিয়ে যাওয়া নিরাপদ হত না; চোখে-মুখে কয়লার ধোঁয়া ঢুকে যাবার বিপদ ছিল। এ ট্রেন ডিজেল ট্রেন, তাই ধোঁয়া নেই। শুধু বুক কাঁপানো গুরুগম্ভীর শব্দ আর চোখ ঝলসানো হেডলাইটের আলো।

ওই এসে পড়ল ট্রেন ব্রিজটার নীচে।

রতনবাবু তাঁর দু'কনুইয়ের উপর ভর দিয়ে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়লেন।

আর ঠিক সেই মুহূর্তে পিছন থেকে দুটো হাত এসে তাঁর পিঠে মারল এক প্রচণ্ড ধাক্কা। রতনবাবু টাল সামলাতে পারলেন না, কারণ রেলিংটা ছিল মাত্র দু'হাত উঁচু।

মেল ট্রেনটা সশব্দে ব্রিজ কাঁপিয়ে চলে গেল পশ্চিম দিকে, যেদিকের আকাশে রক্তের রঙ এখন বেগুনি হয়ে এসেছে।

রতনবাবু এখন আর ব্রিজের উপরে নেই, তবে তাঁর চিহ্নস্বরূপ একটি জিনিস এখনও রেলিং-এর কাঠের একটা ফাটলে আটকে রয়েছে। সেটা সুপুরি আর এলাচে ভরা একটি অ্যালুমিনিয়ামের কৌটো। □

মিঃ শাশমলের শেষ রাত্রি

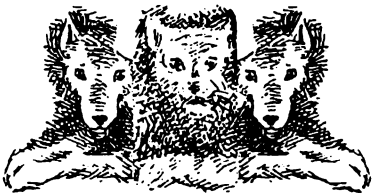

মিঃ শাসমল আরাম কেদারাটায় গা এলিয়ে দিয়ে একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন। মোক্ষম জায়গা বেছেছেন তিনি—উত্তর বিহারের এই ফরেস্ট বাংলো। এর চেয়ে নিরিবিলি নিরাপদ নিরুপদ্রব জায়গা আর হয় না। ঘরটিও দিব্যি। সাহেবি আমলের মজবুত, সুদৃশ্য টেবিল-চেয়ার সাজানো, প্রশস্ত খাটে বালিশ-বিছানা তক্‌তকে পরিষ্কার, ঘরের সঙ্গে লাগোয়া বাথরুমটিও বেশ বড়। পশ্চিমের জানালাটা দিয়ে ফুরফুরে বাতাস আসছে, আর সেই সঙ্গে আসছে ঝিঁঝির একটানা শব্দ। বিজলি না থাকলেও কোনও ক্ষতি নেই; কলকাতার লোড শেডিং-এ কেরোসিনের আলোয় পড়ার অভ্যাস হয়ে গেছে। বাংলোর আলোতে সাদা কাচের শেড থাকার ফলে তাঁর কলকাতার আলোর চেয়ে বেশি বলেই মনে হচ্ছে। সঙ্গে বই আছে—গোয়েন্দা উপন্যাস; মিঃ শাসমলের প্রিয় পাঠ্য।

এক চৌকিদার ছাড়া বাংলোয় অন্য কোনও বাসিন্দা নেই। অর্থাৎ আর কারুর মুখ দেখতে হবে না, কারুর সঙ্গে কথা বলতে হবে না। চমৎকার। কলকাতার ট্যুরিস্ট আপিসে গিয়ে দশদিন আগে থেকে বলে এসেছিলেন এই বাংলোর কথা; দিন চারেক আগে মিঃ শাসমল তাদের কাছ থেকে চিঠিতে জানেন যে ঘর বুক করা হয়ে গেছে। অন্তত তিনটে দিন এখানে থেকে তারপর অন্য কোথাও যাবার কথা ভাবা যাবে। সঙ্গে টাকা আছে যথেষ্ট; মাসখানেক চালিয়ে নেওয়া যাবে অক্লেশে। নিজের গাড়ি আছে সঙ্গে; স্বভাবতই তিনি নিজেই চালিয়ে এসেছেন এই সাড়ে পাঁচশো কিলোমিটার পথ।

চৌকিদার তার কথামতো সাড়ে নটায় ডিনার দিয়ে দিল। হাতের রুটি, অড়হরের ডাল, একটা তরকারি আর মুরগির কারি। ডাইনিং রুমেও সাহেবি আমলের চিহ্ন রয়েছে। টেবিল, চেয়ার, চীনেমাটির পাত্র, বাহারের সাইনবোর্ড—সবই সেই কালের।

'এখানে মশা আছে কি?' খেতে খেতে প্রশ্ন করলেন মিঃ শাসমল। কলকাতায় যে অঞ্চলে তাঁর ফ্ল্যাট, সেখানে মশা নেই। আজ বছর দশেক হল মশারির অভ্যেসটা চলে গেছে। ওটা ব্যবহার না করতে পারলে আরও নিশ্চিন্ত হওয়া যায়।

চৌকিদার জানাল যে শীতকালে মশা হয়, তবে এসময়টা অর্থাৎ এপ্রিলে, মশারির দরকার না হওয়ারই কথা। অবিশ্যি স্টকে আছে মশারি, সাহেবের দরকার হলে খাটিয়ে দেবে। চৌকিদার আরও বলল যে রাত্রে দরজা বন্ধ করে শোয়াই ভাল। চারিদিকে জঙ্গল; আর কিছু না হোক, শেয়াল-টেয়াল ঢুকে পড়তে পারে ঘরে! মিঃ শাসমল অবিশ্যি নিজেই ঠিক করেছিলেন যে দরজা বন্ধ রাখবেন।

খাওয়ার পর ডাইনিং রুম থেকে বারান্দায় বেরিয়ে এসে হাতের টর্চটা জ্বালিয়ে জঙ্গলের দিকে ফেললেন মিঃ শাসমল। শাল গাছের গুঁড়ির উপর পড়ল আলো। তারপর আলোটা এদিক-ওদিক ঘুরিয়ে দেখলেন কোনও জানোয়ার জাতীয় কিছু দেখা যায় কি না। চোখে পড়ল না কিছুই। নিস্তব্ধ বন, ঝিঁঝি ডেকে চলেছে অবিরাম।

'বাংলোয় ভূত-টুত আছে নাকি হে!' হালকা ভাবে প্রশ্ন করলেন মিঃ শাসমল। চৌকিদার খাবার সরঞ্জাম তুলে নিয়ে তার ঘরের দিকে যাচ্ছিল, সে খালি একটু হেসে জানিয়ে দিল যে সে এখানে পঁয়ত্রিশ বছর আছে, বহু লোক এই বাংলোয় থেকে গেছে, কেউ কোনওদিন ভূত দেখেনি। কথাটা শুনে মিঃ শাসমল আরও খানিকটা হালকা বোধ করলেন।

ডাইনিং রুমের পর একটা ঘর ছেড়েই তাঁর নিজের ঘর। তাই আর খেতে যাবার সময় দরজাটা বন্ধ করেননি; ঘরে ঢুকে বুঝলেন বন্ধ রাখলেই ভাল ছিল। এই ফাঁকে কখন জানি একটা কুকুর ঢুকে পড়েছে। নেড়ি কুকুর। সাদার উপর বাদামি ছোপ, রুগ্ণ, হাড় বার করা চেহারা।

'অ্যাই—ভাগ্, ভাগ্—নিকালো হিঁয়াসে!'

কুকুর ঘরের এক কোণে বসে আছে; ধমকে কোনও কাজ হল না। যেন এই ঘরেই রাত কাটাবে এমন একটা ভাব নিয়ে বসে রইল।

'অ্যাই কুত্তা—ভাগ্, ভাগ্!'

এবারে কুকুরটা মিঃ শাসমলের দিকে দাঁত খিঁচিয়ে দিল।

মিঃ শাসমল দু'পা পিছিয়ে এলেন। ছেলেবেলায় যখন বেকবাগানে থাকতেন তখন একজন প্রতিবেশীর ছেলেকে পাগলা কুকুরে কামড়ায়; ফলে ছেলেটির হয় জলাতঙ্ক। মিঃ শাসমলের স্মৃতিতে সেটা একটা বিভীষিকার আকার ধারণ করে আছে। দাঁত খিঁচোনো কুকুরের দিকে এগোনোর হিম্মৎ তাঁর নেই।

আড় দৃষ্টি কুকুরের দিকে রেখে মিঃ শাসমল ঘর থেকে বারান্দায় বেরোলেন।

'চৌকিদার।'

'বাবু!'

'একবার এদিকে এসো তো।'

চৌকিদার গামছা দিয়ে হাত মুছতে মুছতে এগিয়ে এল।

'আমার ঘরে একটা কুকুর ঢুকেছে; ওটাকে তাড়াও তো।'

'কুত্তা?'—চৌকিদার যেন ভারী অবাক হয়েছে বলে মনে হল।

'কেন, কুকুর নেই নাকি এ তল্লাটে? তুমি আকাশ থেকে পড়লে যে। ঘরে এসো, দেখিয়ে দিচ্ছি।'

চৌকিদার মিঃ শাসমলের দিকে একটা সন্দিগ্ধ দৃষ্টি দিয়ে তাঁর ঘরে ঢুকল।

'কাঁহা হ্যায় কুত্তা, বাবু?'

মিঃ শাসমলও ঢুকলেন তার পিছন পিছন। সত্যিই তো, এই দু'মিনিটের মধ্যে কুকুর ভেগেছে। তাও নিশ্চিন্ত হবার জন্য চৌকিদার খাটের তলা এবং পাশের বাথরুমটা দেখে নিল।

'নেহি বাবু, কুত্তা নেহি হ্যায়।'

'ছিল, চলে গেছে।'

মিঃ শাসমলের নিজেকে একটু বোকা লাগছিল। চৌকিদারকে ফেরত পাঠিয়ে দিয়ে তিনি আবার আরাম কেদারায় বসলেন। প্রায় শেষ হয়ে যাওয়া সিগারেটটা ক্যারামের ঘুঁটি মারার মতো করে জানালা দিয়ে ফেলে দিয়ে দু'হাত মাথার উপর তুলে আড় ভাঙতে গিয়ে দেখেন—কুকুর যায়নি, অথবা এরই মধ্যে কুকুর আবার ফিরে এসেছে, এবং সেই ভাবেই ঘরের কোণে দাঁড়িয়ে আছে।

জ্বালাতনের একশেষ। রাত্তিরে তাঁর নতুন চটিটার দফারফা করবে। ফেলে রাখা চটির ওপর কুকুরের লোভের কথা মিঃ শাসমল জানেন। মেঝে থেকে বাটার চটিটা তুলে নিয়ে টেবিলের উপর রেখে দিলেন তিনি।

ঘরের একজন বাসিন্দা বাড়ল। এখন থাকুক, ঘুমোনোর আগে আরেকটা চেষ্টা দেবেন ব্যাটাকে বিদেয় করার।

মিঃ শাসমল হাত বাড়িয়ে টেবিলে রাখা এয়ার-লাইনস ব্যাগটা থেকে গোয়েন্দা উপন্যাসটা বার করলেন। ভাঁজ করা পাতায় আঙুল ঢুকিয়ে যেই খুলতে যাবেন, অমনি তাঁর চোখ গেল কুকুরের কোণের বিপরীত কোণে। সেখানে কখন যে আরেকটি প্রাণী এসে আস্তানা গেড়েছে সেটা শাসমল আদৌ টের পান নি।

একটা বেড়াল। বাঘের মতো ডোরাকাটা বেড়াল। ঘোলাটে চোখ তাঁরই দিকে রেখে কুণ্ডলী পাকিয়ে বসে আছে।

এরকম বেড়াল কোথায় দেখেছেন মিঃ শাসমল?

হ্যাঁ, মনে পড়েছে। তাঁর বাড়ির পাশেই মুখুজ্যেদের সাতটা বেড়ালের একটা ছিল ঠিক ওইরকম দেখতে। একদিন রাত্রে—

ঘটনাটা মনে পড়ে গেল মিঃ শাসমলের।

মাস ছয়েক আগে একদিন রাত্রে বেড়ালের কান্নায় ঘুম ভেঙে গিয়েছিল মিঃ শাসমলের। তখন মেজাজটা ভাল যাচ্ছিল না তাঁর। তাঁর অংশীদার অধীরের

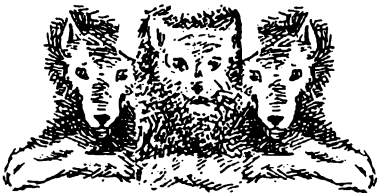

সঙ্গে তার আগের দিনই প্রচণ্ড বচসা হয়েছে—প্রায় হাতাহাতি। অধীর শাসিয়েছে পুলিশের কাছে তাঁর কারচুপি ফাঁস করে দেবে। সেই অবস্থায় ঘুম এমনিতেই ভাল হচ্ছিল না, তার উপর এই বেড়ালের কাঁদুনি। আরও আধ ঘণ্টা এই কান্না শুনে আর থাকতে না পেরে একটা ভারী কাচের পেপারওয়েট তুলে নিয়ে কান্নার উৎস লক্ষ্য করে মিঃ শাসমল সজোরে নিক্ষেপ করেন। তৎক্ষণাৎ কান্না থেমে যায়। পরদিন সকালে মুখুজ্যেদের বাড়িতে হুলস্থূল কাণ্ড। তাদের সাধের হুলোকে মাঝরাত্তিরে কে যেন নৃশংসভাবে খুন করেছে। মিঃ শাসমলের খুব মজা লেগেছিল কথাটা শুনে। বেড়াল খুন! সেরকম দেখতে গেলে তো মানুষ হামেশাই খুন করছে। মনে পড়ল একবার—বহুদিন আগের ঘটনা, মিঃ শাসমল তখন কলেজে পড়েন, হোস্টেলে থাকেন—ঘরের দেয়ালে পিঁপড়ের লম্বা লাইন দেখে, একটা খবরের কাগজের টুকরোয় দেশলাই ধরিয়ে সেই লাইনের এ-মাথা থেকে ও-মাথা জ্বলন্ত কাগজটা একবার বুলিয়ে দিতেই সব ক'টা পিঁপড়ে এক সঙ্গে মরে কুঁকড়ে দেয়াল থেকে ঝরে পড়েছিল মেঝেতে। পিঁপড়ে খুন!.....

মিঃ শাসমল রিস্টওয়াচের দিকে চেয়ে দেখলেন দশটা বেজে দশ। মাস খানেক থেকে মাথায় একটা দপদপানি অনুভব করছিলেন তিনি; সেটা এখন আর নেই। আর মাথা গরম ভাবটা, যেটার জন্য তাঁকে দিনে তিনবার স্নান করতে হত, সেটাও আর বোধ করছেন না তিনি।

মিঃ শাসমল বইটা খুলে মুখের সামনে ধরলেন। দু' লাইন পড়ে আবার চোখ চলে গেল বেড়ালটার দিকে। সেটা এরকম ভাবে চেয়ে রয়েছে কেন তাঁর দিকে?

নাঃ, একা থাকার বাসনা তাঁকে ত্যাগ করতে হল। অবিশ্যি মানুষ তো তিনি একাই; সেটাই ভরসা। রাত্রে এই দুই প্রাণী যদি উৎপাত না করে তা হলে ঘুম না হবার কোনও কারণ নেই। ঘুমটা খুবই দরকার। গত কয়েকটা দিন স্বাভাবিক কারণেই তাঁর ভাল ঘুম হয়নি। ঘুমের বড়ি খাওয়ার আধুনিক বাতিকটা তাঁর নেই।

মিঃ শাসমল টেবিল থেকে ল্যাম্পটা তুলে বিছানার পাশে ছোট টেবিলটায় রাখলেন। তারপর গায়ের জামা খুলে আলনায় টাঙিয়ে, ফ্লাস্ক থেকে এক গেলাস জল ঢেলে খেয়ে হাতে বই নিয়ে বিছানায় শুনে পড়লেন।

পায়ের দিকে কুকুর। সেটা বসা অবস্থা থেকে উঠে দাঁড়িয়েছে, দৃষ্টি মিঃ শাসমলের দিকে।

কুকুর খুন?

মিঃ শাসমলের বুকের ভিতরে ধড়াস করে উঠল।

হ্যাঁ, তা এক রকম খুন বইকী। ঘটনাটা মনে পড়ে গেছে। বোধহয় তিয়াত্তর সাল। গাড়িটা তখন সবে কিনেছেন মিঃ শাসমল। চালক হিসাবে তিনি কিঞ্চিৎ 'র‍্যাশ'। কলকাতার ভিড়ে স্পিড তোলা সম্ভব নয়, তাই বোধহয় শহর থেকে বেরোলেই মিঃ শাসমলের স্পিডোমিটারের কাঁটা তরতরিয়ে উঠে যায় উপর দিকে। ৭০ মাইল স্পিড না ওঠা পর্যন্ত তাঁর মন অতৃপ্ত থেকে যায়। সেই অবস্থায় একবার ন্যাশনাল হাইওয়ে দিয়ে কোলাঘাট যাবার পথে একটা নেড়ি কুকুর তাঁর গাড়ির তলায় পড়ে। সাদার উপর বাদামি ছোপ। মিঃ শাসমল তা সত্ত্বেও গাড়ির স্পিড কমাননি। যে কুকুর খেতে পায় না, যার পাঁজরার হাড় গোনা যায়, তার বেঁচে থেকে লাভ কী—এমন একটা ধারণা মনে এনে অপরাধবোধ লাঘব করতে চেষ্টা করেছিলেন এটাও মনে আছে।

কিন্তু এই স্মৃতিই তাঁর মনের নিরুদ্বেগ ভাবটাকে একেবারে তছনছ করে দিল।

জীবনে যত প্রাণী হত্যা করেছেন তিনি তার সবগুলোই কি আজ এই ঘরে এসে হাজির হবে নাকি? সেই যে সেই প্রথম পাওয়া এয়ার গান দিয়ে মারা কুচ-কুচে কালো নাম-না-জানা পাখি আর সেবার সেই ঝাড়গ্রামে মামাবাড়িতে থান ইঁট দিয়ে—

হ্যাঁ, সেটাও এসেছে।

জানালার দিকে চোখ যেতেই মিঃ শাসমল সাপটাকে দেখতে পেলেন। হাত চারেক লম্বা একটি গোখরো। তার মসৃণ দেহটা জানালা দিয়ে ঢুকে দেয়ালের সংলগ্ন টেবিলটার উপর উঠেছে। এপ্রিল মাসে সাপ বেরোয় না; কিন্তু সাপ বেরিয়েছে।

সাপের তিন ভাগের দুই ভাগ রয়ে গেল টেবিলের উপর। বাকি এক ভাগ টেবিল ছেড়ে উঁচিয়ে উঠল ফণা তোলার ভঙ্গিতে। ল্যাম্পের আলোয় জ্বলজ্বল করছে তার নির্মম, নিষ্পলক দুটি চোখ।

ঝাড়গ্রামে তাঁর মামাবাড়িতে ঠিক এমনই একটা গোখরোর মাথা থেঁতলে দিয়েছিলেন মিঃ শাসমল থান ইঁট মেরে। সেটা ছিল নাকি বাস্তুসাপ, কারুর কোনও অনিষ্ট করেনি কোনওদিন।

মিঃ শাসমল অনুভব করলেন তাঁর গলা একদম শুকিয়ে গেছে। চেঁচিয়ে যে চৌকিদারকে ডাকবেন তার কোনও উপায় নেই।

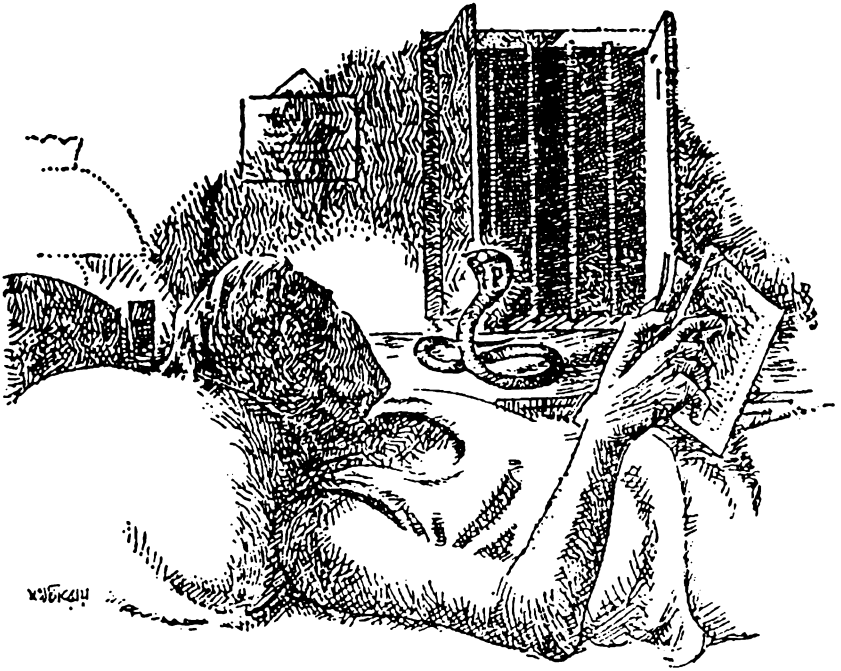

বাইরে ঝিঁঝির ডাক থেমে গিয়ে চারিদিকে এক অপার্থিব নিস্তব্ধতা। হাতঘড়ির কোনও শব্দ নেই, না হলে সেটা শোনা যেত। একবার মিঃ শাসমলের মনে হল তিনি হয়তো স্বপ্ন দেখেছেন। সম্প্রতি দু-একবার এরকম হয়েছে। নিজের ঘরে নিজের খাটে শুয়ে হঠাৎ মনে হয়েছে তিনি যেন অন্য কোথাও রয়েছেন, ঘরে অচেনা লোকজন চলাফেরা করছে, অস্ফুট স্বরে কথা বলছে। কিন্তু সেটা কয়েক মুহূর্তের জন্য। ঘুমিয়ে পড়ার ঠিক আগের মুহূর্তে বোধহয় এরকম হয়। এও একরকম স্বপ্ন, যদিও পুরোপুরি স্বপ্ন নয়।

আজ অবিশ্যি স্বপ্ন দেখছেন না তিনি। নিজের গায়ে চিমটি কেটে বুঝেছেন তিনি জেগেই আছেন। যা ঘটেছে তা সত্যিই তাঁর চোখের সামনে ঘটেছে, এবং তাঁকে দেখানোর জন্যই ঘটছে।

আরও ঘণ্টা খানেক এই ভাবে শুয়ে রইলেন মিঃ শাসমল। ইতিমধ্যে মশা ঢুকেছে ঘরে। কামড় তিনি অনুভব করেননি এখনও, কিন্তু তারা যে আশেপাশে ঘোরাফেরা করছে সেটা চোখে দেখে এবং কানে শুনে বুঝছেন। কত মশা মেরেছেন তিনি জীবনে তার কি হিসেব আছে?

শেষ পর্যন্ত প্রাণীদের দিক থেকে উৎপাতের কোনও ইঙ্গিত না পেয়ে মিঃ

শাসমল খানিকটা নিশ্চিন্ত বোধ করলেন! এবার ঘুমোনোর চেষ্টা দিলে কেমন হয়?

ল্যাম্পটা কমানোর জন্য হাত বাড়াতেই বাইরে থেকে একটা শব্দ এল। বাংলোর গেট থেকে বারান্দার সিঁড়ি পর্যন্ত পথটা নুড়ি দিয়ে ঢাকা। সেই পথ দিয়ে কেউ হেঁটে আসছে।

চতুষ্পদ নয়, দ্বিপদ।

এবারে মিঃ শাসমল বুঝলেন তাঁর সর্বাঙ্গ ঘামে ভিজে আসছে, আর তাঁর হৃৎস্পন্দনের শব্দ তিনি নিজের কানে শুনতে পাচ্ছেন।

বেড়াল কুকুরের দৃষ্টি এখনও তাঁর দিকে। মশা গান গেয়ে চলেছে তাঁর কানের পাশে। গোখরোর ফণা এখনও তোলা; কোনও অদৃশ্য সাপুড়ের অশ্রুত বাঁশির তালে তালে যেন সেই ফণা দুলছে।

পায়ের শব্দ এবার বারান্দায়। এগিয়ে আসছে।

ফুরুৎ করে একটা কুচকুচে কালো পাখি জানালা দিয়ে ঢুকে টেবিলে বসল। এই সেই পাখি—তাঁর এয়ার গানের গুলি খেয়ে যেটা পাঁচিল থেকে টুপ্ করে পড়েছিল পাশের বাড়ির বাগানে।

পায়ের শব্দ তাঁর ঘরের দরজার বাইরে থামল।

মিঃ শাসমল জানেন কে এসেছে। অধীর। অধীর চক্রবর্তী। তাঁর পার্টনার। এককালে বন্ধু ছিল, কিন্তু সম্প্রতি পরস্পরে প্রায় কথা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল।

মিঃ শাসমলের ব্যবসায়িক কারচুপি অধীরের পছন্দ হয়নি। তাঁকে শাসিয়েছিল পুলিশে ধরিয়ে দেবে বলে। মিঃ শাসমল উলটে বলেছিলেন—ব্যবসার ক্ষেত্রে সিধে রাস্তাটা হল মূর্খের রাস্তা। অধীর সেটা মানেনি। এটা আগে জানা থাকলে কখনই তাকে অংশীদার করতেন না মিঃ শাসমল। তিনি বুঝেছিলেন অধীর তাঁর পরম শত্রু। শত্রুর শেষ রাখতে নেই। শেষ রাখেননি মিঃ শাসমল। গতকাল রাত্রে অধীরেরই বৈঠকখানায় দুজনে মুখোমুখি বসেছিলেন। মিঃ শাসমলের পকেটে রিভলভার। খুনের অভিপ্রায় নিয়েই এসেছেন তিনি। মাত্র চার হাত দূরে বসে অধীর। অধীরের গলা যখন ভর্ৎসনার সপ্তমে চড়েছে, তখন রিভলভার বার করে গুলি চালান মিঃ শাসমল। তাঁর হাতে আগ্নেয়াস্ত্র দেখে এককালের বন্ধু অধীর চক্রবর্তীর মুখের অবস্থা কী হয়েছিল সেটা ভাবতে হাসি এল মিঃ শাসমলের। খুনটা করার দশ মিনিটের মধ্যেই তিনি গাড়িতে বেরিয়ে পড়েন। রাতটা বর্ধমান স্টেশনের ওয়েটিং রুমে কাটিয়ে আজ সকালে এই দশ দিন আগে রিজার্ভ করা বাংলোর উদ্দেশে রওনা দেন।

দরজায় আঘাত পড়ল। একবার, দু'বার তিনবার।

মিঃ শাসমল চেয়ে আছেন দরজার দিকে। তাঁর সর্বাঙ্গে কাঁপুনি ধরেছে, দম বন্ধ হয়ে আসছে।

'দরজা খোল, জয়ন্ত। আমি অধীর। দরজা খোল।'

যাকে তিনি গতকাল রাত্রে খুন করে এসেছেন, এই সেই অধীর। একটা কারণে তাঁর মনে সন্দেহ ছিল খুনটা ঠিক হয়েছে কি না, কিন্তু এখন আর সন্দেহ নেই। ওই কুকুর, ওই বেড়াল, ওই সাপ, ওই পাখি—আর এখন দরজার বাইরে অধীর। সবাই যখন এসেছে মৃত্যুর পরে, তখন অধীরও আসবে এটাই সঙ্গত।

আবার দরজায় ঘন ঘন করাঘাত।

মিঃ শাসমলের দৃষ্টি ঝাপসা, কিন্তু তিনি দেখতে পাচ্ছেন কুকুরটা তাঁর দিকে এগোচ্ছে, বেড়ালের চোখ তাঁর নিজের চোখের এক হাতের মধ্যে, সাপটা টেবিলের পায়া বেয়ে মেঝেতে নামছে তাঁরই দিকে এগোবে বলে, পাখিটা এসে তাঁর খাটের উপর বসল, তাঁর বুকে গেঞ্জির ওপর অজস্র পিঁপড়ে এসে হাজির হয়েছে.....

শেষ পর্যন্ত দুই কনস্টেবলের ঠেলায় দরজা ভাঙল।

অধীরবাবুই পুলিশ নিয়ে এসেছেন কলকাতা থেকে। মিঃ শাসমলের কাগজপত্র থেকে ট্যুরিস্ট ডিপার্টমেন্টের একটা চিঠি বেরোয়; এই বাংলো রিজার্ভ করার খবর ছিল তাতে।

ঘরে ঢুকে মিঃ শাসমলকে মৃত অবস্থায় দেখে ইনস্পেক্টর সামন্ত অধীরবাবুকে

জিজ্ঞেস করলেন তাঁর পার্টনারের হার্টের ব্যারাম ছিল কি না। অধীরবাবু বললেন, 'হার্টের কথা জানি না, তবে ইদানীং ওর মাথাটা গোলমাল করছিল। যে ভাবে টাকা এদিক-ওদিক করেছে, আমাকে যে ভাবে ঠকিয়েছে, সেটা সুস্থ-মস্তিষ্ক লোকের পক্ষে সম্ভব নয়। অবিশ্যি ওর হাতে রিভলভার দেখে সে ধারণা আরও বদ্ধমূল হয়। সত্যি বলতে কী, ও যখন ওটা বার করল পকেট থেকে, তখন আমি নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারিনি। ও গুলি মেরে পালানোর পর দশ মিনিট লেগেছিল আমার সংবিৎ ফিরে পেতে। তখনই ঠিক করি এই উন্মাদকে পুলিশের হাতে তুলে দিতে হবে। আমি যে খুন হইনি, সেটা নেহাতই দৈবক্রমে।'

মিঃ সামন্ত ভ্রূকুঞ্চিত করে বললেন, 'কিন্তু এত কাছ থেকে আপনাকে মিস্ করলেন কী করে?'

অধীরবাবু মৃদু হেসে বললেন, 'কপালে মৃত্যু না থাকলে আর মানুষ কী করে মরে বলুন! গুলি তো আমার গায়ে লাগেনি। লেগেছিল আমার সোফার গায়ে। অন্ধকারে লক্ষ্যভেদ করার ক্ষমতা আর ক'জনের থাকে? রিভলভার বার করার সঙ্গে সঙ্গে যে আমার পাড়ায় লোড শেডিং হয়ে যায়!' □

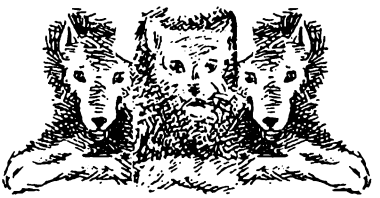

ভূত

নবীনকে দ্বিতীয়বার হতাশ হয়ে ফিরে আসতে হল। অক্রূরবাবুর মন ভেজানো গেল না। উত্তরপাড়ার একটা ফাংশনে নবীন পেয়েছিল অক্রূর চৌধুরীর আশ্চর্য ক্ষমতার পরিচয়। ভেন্‌ট্রিলোকুইজ্‌ম। খেলার নামটা নবীনের জানা ছিল না। সেটা বলে দেয় দ্বিজপদ। দ্বিজুর বাবা অধ্যাপক, তাঁর লাইব্রেরিতে নানান বিষয়ের বই। দ্বিজু নামটা বলে বানানটাও শিখিয়ে দিল। ভি-ই-এন-টি-আর-আই-এল-ও-কিউ-ইউ-আই-এস-এম। ভেন্‌ট্রিলোকুইজ্‌ম। অক্রূর চৌধুরী মঞ্চে একা মানুষ, কিন্তু তিনি কথা চালিয়ে যাচ্ছেন আর-একজন অদৃশ্য মানুষের সঙ্গে। সেই মানুষ যেন হলের সিলিং-এর কাছাকাছি কোথাও শূন্যে অবস্থান করছে। অক্রূরবাবু তাকে উদ্দেশ করে প্রশ্ন করেন, তারপর উত্তর আসে উপর থেকে।

'হরনাথ, কেমন আছ?'

'আজ্ঞে আপনার আশীর্বাদে ভালই আছি।'

'শুনলাম তুমি নাকি আজকাল সংগীতচর্চা করছ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, ঠিকই শুনেছেন।'

'রাগ সংগীত?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, রাগ সংগীত।'

'গান করো?'

আজ্ঞে না।'

'যন্ত্র সংগীত?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'কী যন্ত্র? সেতার?'

'আজ্ঞে না।'

'সরোদ?'

'আজ্ঞে না।'

'তবে কী বাজাও?'

'আজ্ঞে গ্রামোফোন।'

হাসি আর হাততালিতে হল মুখর হয়ে ওঠে। প্রশ্নটা উপর দিকে চেয়ে করে উত্তরটা শোনার ভঙ্গিতে মাথাটা একটু হেঁট করে নেন অক্রূরবাবু, কিন্তু তিনি নিজেই যে উত্তরটা দিচ্ছেন সেটা বোঝার কোনও উপায় নেই। ঠোঁট একদম নড়ে না।

নবীন তাজ্জব বনে গিয়েছিল। এ জিনিস শিখতে না পারলে জীবনই বৃথা। অক্রূর চৌধুরী কি ছাত্র নেবেন না? নবীনের পড়াশুনোয় আগ্রহ নেই। হাইয়ার সেকেণ্ডারি পাশ করে বসে আছে বছর তিনেক। আর পড়ার ইচ্ছে হয়নি। বাপ নেই, কাকার বাড়িতেই মানুষ সে। কাকার একটা প্লাইউডের কারখানা আছে; তাঁর ইচ্ছে নবীনকে সেখানেই ঢুকিয়ে দেন, কিন্তু নবীনের শখ হল ম্যাজিকের দিকে। হাত সাফাই, রুমালের ম্যাজিক, আংটির ম্যাজিক, বলের ম্যাজিক—এসব সে বাড়িতেই অভ্যাস করে বেশ খানিকটা আয়ত্ত করেছে। কিন্তু অক্রূর চৌধুরীর ভেন্‌ট্রিলোকুইজ্‌ম দেখার পরে সেগুলোকে নিরামিষ বলে মনে হচ্ছে।

ফাংশনের উদ্যোক্তাদের কাছেই নবীন জানল যে অক্রূরবাবু থাকেন কলকাতায় অ্যামহার্স্ট লেনে। পরদিনই ট্রেনে চেপে কলকাতায় এসে সে সোজা চলে গেল যাঁকে গুরু বলে মেনে নিয়েছে তাঁর বাড়িতে। গুরু কিন্তু বাদ সাধলেন।

'কী করা হয় এখন?' প্রথম প্রশ্ন করলেন ভেন্‌ট্রিলোকুইস্ট। কাছ থেকে ভদ্রলোককে দেখে হৃৎকম্প শুরু হয়ে গিয়েছিল নবীনের। বয়স পঁয়তাল্লিশের বেশি নয়, চাড়া দেওয়া ঘন কালো গোঁফ, মাথার কালো চুলের ঠিক মধ্যিখানে টেরি, তার দু'দিক দিয়ে ঢেউ খেলে চুল নেমে এসেছে কাঁধ পর্যন্ত। চোখ দুটো ঢুলুঢুলু, যদিও স্টেজে এই চোখই স্পটলাইটের আলোতে ঝিলিক মারে।

নবীন বলল সে কী করে।

'এই সব শখ হয়েছে কেন?'

নবীন সত্যি কথাটাই বলল। —'একটু-আধটু ম্যাজিকের অভ্যাস আছে, কিন্তু এটার শখ হয়েছে আপনার সেদিনের পারফরম্যান্স দেখে।'

অক্রূরবাবু মাথা নাড়লেন।

'এ জিনিস সকলের হয় না। অনেক সাধনা লাগে। আমাকেও কেউ শেখায়নি। যদি পার তো নিজে চেষ্টা করে দেখো।'

নবীন সেদিনের মতো উঠে পড়ল, কিন্তু সাতদিন বাদেই আবার অ্যামহার্স্ট লেনে গিয়ে হাজির হল। ইতিমধ্যে সে খালি ভেন্‌ট্রিলোকুইজ্‌মের স্বপ্ন দেখেছে। এবার দরকার হলে সে অক্রূরবাবুর হাতে পায়ে ধরবে।

কিন্তু এবার আরও বিপর্যয়। এবার অক্রূরবাবু তাকে একরকম বাড়ি থেকে বারই করে দিলেন। বললেন, 'আমি যে শেখাব না সেটা প্রথমবারেই তোমার বোঝা উচিত ছিল। সেটা বোঝোনি মানে তোমার ঘটে বুদ্ধি নেই। বুদ্ধি না থাকলে কোনওরকম ম্যাজিক চলে না—এ ম্যাজিক তো নয়ই।'

প্রথমবারে নবীন মুষড়ে পড়েছিল, এবারে তার মাথা গরম হয়ে গেল। চুলোয় যাক অক্রূর চৌধুরী। সে যদি না শেখায় তবে নবীন নিজেই শিখবে, কুছ পরোয়া নেহি।

নবীনের মধ্যে যে এতটা ধৈর্য আর অধ্যবসায় ছিল সেটা সে নিজেই জানত না। কলেজ স্ট্রিটে একটা বইয়ের দোকান থেকে ভেন্‌ট্রিলোকুইজ্‌ম সম্বন্ধে একটা বই কিনে নিয়ে সে শুরু করে দিল তার সাধনা।

মোটামুটি নিয়মটা সহজ। প বর্গের অর্থাৎ প ফ ব ভ ম, কেবল এই ক'টা অক্ষর উচ্চারণ করার সময় ঠোঁটে ঠোঁট ঠেকে, ফলে ঠোঁট নাড়াটা ধরা পড়ে বেশি। এই ক'টা অক্ষর না থাকলে যে কোনও কথাই ঠোঁট ফাঁক করে অথচ না নাড়িয়ে বলা যায়। কোনও কথায় প বর্গের অক্ষর থাকলে সেখানেও উপায় আছে। যেমন, 'তুমি কেমন আছ' কথাটা যদি 'তুঙি কেঙন আছ' করে বলা যায়, তা হলে আর ঠোঁট নাড়াবার দরকারই হয় না, কেবল জিভ নাড়ালেই চলে। প ফ ব ভ ম-এর জায়গায় ক খ গ ঘ ঙ—এই হল নিয়ম। কথোপকথন যদি হয় এই রকম—'তুমি কেমন আছ?' 'ভাল আছি', 'আজ বেশ ঠাণ্ডা পড়েছে, তাই না?' 'তা পড়েছে, দিব্যি ঠাণ্ডা।' —তা হলে সেটা বলতে হবে এই ভাবে—'তুমি কেমন আছ?' 'ঘালো আছি' 'আজ বেশ ঠাণ্ডা পড়েছে, তাই না?' 'তা কড়েছে, দিগ্যি ঠাণ্ডা।'।

আরও আছে। উত্তরদাতার গলার আওয়াজটাকে চেপে নিজের আওয়াজের চেয়ে একটু তফাত করে নিতে হবে। এটাও সাধনার ব্যাপার, এবং এটাতেও অনেকটা সময় দিল নবীন। কাকা এবং কিছু অন্তরঙ্গ বন্ধুকে শুনিয়ে যখন সে তারিফ পেল, তখনই বুঝল যে ভেন্‌ট্রিলোকুইজ্‌ম ব্যাপারটা তার মোটামুটি রপ্ত হয়েছে।

কিন্তু এখানেই শেষ নয়।

সেই অদৃশ্য উত্তরদাতার যুগ আর আজকাল নেই। আজকাল ভেন্‌ট্রিলোকুইস্টের কোলে থাকে পুতুল। সেই পুতুলের পিছন দিয়ে হাত ঢুকিয়ে মাথা ঘোরায় এবং ঠোঁট নাড়ায় জাদুকর। মনে হয় জাদুকরের প্রশ্নের উত্তর বেরোচ্ছে এই পুতুলের মুখ দিয়েই।

তার আশ্চর্য প্রোগ্রেসে খুশি হয়ে কাকাই এই পুতুল বানাবার খরচ দিয়ে দিলেন নবীনকে। পুতুলের চেহারা কেমন

হবে এই নিয়ে দিন পনেরো ধরে গভীর চিন্তা করে হঠাৎ এক সময় নবীনের মাথায় এল এক আশ্চর্য প্ল্যান।

পুতুল দেখতে হবে অবিকল অক্রূর চৌধুরীর মতো। অর্থাৎ অক্রূর চৌধুরীকে হাতের পুতুল বানিয়ে সে তার অপমানের প্রতিশোধ নেবে।

একটা হ্যাণ্ডবিলে অক্রূর চৌধুরীর একটা ছবি ছিল সেটা নবীন সযত্নে রেখে দিয়েছিল। সেটা সে আদিনাথ কারিগরকে দেখাল। —'এইরকম গোঁফ, এই টেরি, এইরকম ঢুলুঢুলু চোখ, ফোলা ফোলা গাল।' সেই পুতুল যখন মুখ নাড়বে আর ঘাড় ঘোরাবে নবীনের কোলে বসে, তখন কী রগড়টাই না হবে! আশা করি তার শো দেখতে আসবেন অক্রূর চৌধুরী!

সাতদিনের মধ্যে পুতুল তৈরি হয়ে গেল। পোশাকটাও অক্রূর চৌধুরীর মতো; কালো গলাবন্ধ কোটের তলায় কোঁচা কোমরে গোঁজা ধুতি।

নেতাজী ক্লাবের শশধর বোসের সঙ্গো নবীনের আলাপ ছিল; তাদের একটা ফাংশনে শশধরকে ধরে তার ভেন্ট্রিলোকুইজ্‌মের একটা আইটেম ঢুকিয়ে নিল নবীন। আর প্রথম অ্যাপিয়েরেন্সেই যাকে বলে হিট। পুতুলের একটি নামও দেওয়া হয়েছে অবশ্য—ভূতনাথ, সংক্ষেপে ভূতো। ভূতোর সঙ্গো নবীনের সংলাপ লোকের কাছে খুবই উপভোগ্য হয়েছিল। ভূতো হল ইস্টবেঙ্গালের সাপোর্টার, আর নবীন মোহনবাগানের। বাগ্‌বিতণ্ডা এতই জমেছিল যে ভূতো যে ক্রমাগত ইস্টগেংগল আর ঙোহনবাগান বলে চলেছে সেটা কেউ লক্ষ্যই করেনি।

এর পর থেকেই বিভিন্ন ফাংশনে, টেলিভিশনে ডাক পড়তে লাগল নবীনের। নবীনও বুঝল যে ভবিষ্যৎ নিয়ে তার আর কোনও চিন্তা নেই, রুজি-রোজগারের পথ সে পেয়ে গেছে।

অবশেষে একদিন অক্রূর চৌধুরীর সঙ্গো দেখা হল নবীনের।

মাস তিনেক হল নবীন উত্তরপাড়া ছেড়ে কলকাতায় মির্জাপুর স্ট্রিটে একটা ঘর ভাড়া নিয়ে রয়েছে। বাড়িওয়ালা সুরেশ মুৎসুদ্দি বেশ লোক, নবীনের খ্যাতির কথা জেনে তাকে সমীহ করে চলেন। সম্প্রতি মহাজাতি সদনে একটা বড় ফাংশনে নবীন এবং ভূতো প্রচুর বাহবা পেয়েছে। ফাংশনের উদ্যোক্তাদের মধ্যে আজকাল নবীনকে নিয়ে কাড়াকাড়ি পড়ে গেছে। নবীনের নিজের ব্যক্তিত্বেও সাফল্যের ছাপ পড়েছে, তার চেহারা ও কথাবার্তায় একটা নতুন জৌলুস লক্ষ্য করা যায়।

হয়তো মহাজাতি সদনের অনুষ্ঠানেই অক্রূরবাবু উপস্থিত ছিলেন, এবং অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তাদের কাছ থেকে নবীনের ঠিকানা জোগাড় করেছিলেন। সেদিনের আইটেমে নবীন আর ভূতোর মধ্যে কথাবার্তা ছিল পাতাল রেল নিয়ে। যেমন—

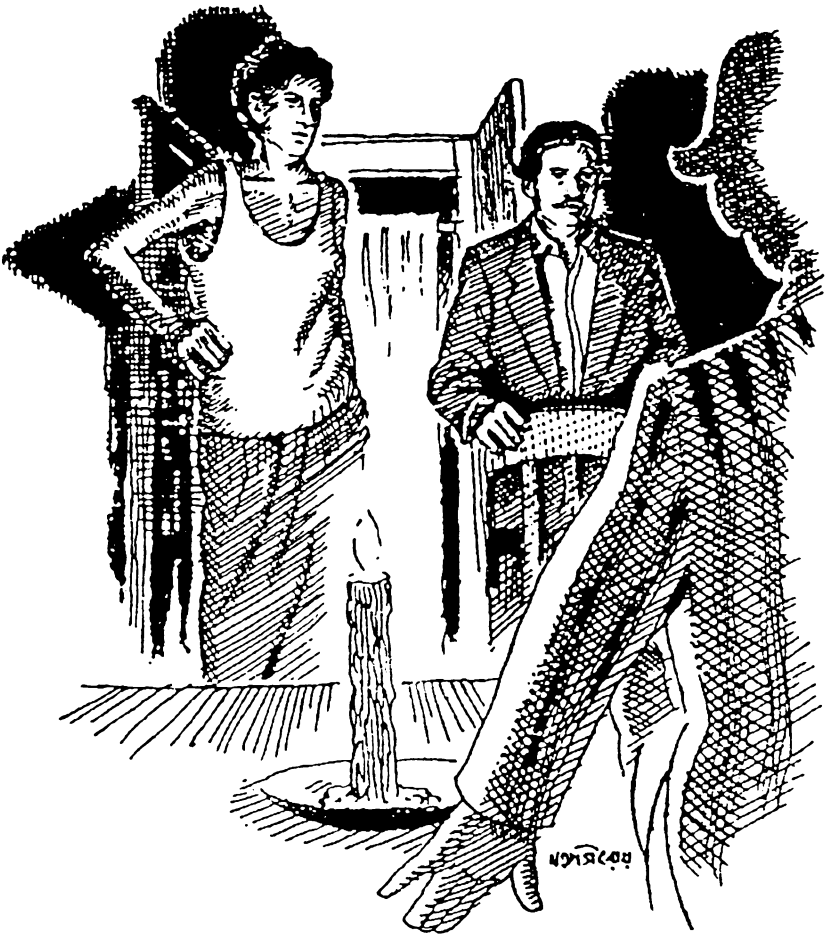

'কলকাতায় পাতাল রেল হচ্ছে জানো তো ভূতো?'

'কই না তো।'

'সে কী, তুমি কলকাতার মানুষ হয়ে পাতাল রেলের কথা জানো না?'

ভূতো মাথা নেড়ে বলল, 'উঁহু, তবে হাসপাতাল রেলের কথা শুনেছি বটে।'

'হাসপাতাল রেল?'

'তাই তো শুনি। একটা বিরাট অপারেশন, সারা শহরের গায়ে ছুরি চলছে, শহরের এখন-তখন অবস্থা। হাসপাতাল ছাড়া আর কী?'

আজ নবীন তার ঘরে বসে নতুন সংলাপ লিখছিল লোড শেডিংকে কেন্দ্র করে। লোড শেডিং, জিনিসের দাম বাড়া, বাস-ট্রামে ভিড় ইত্যাদি যে সব জিনিস নিয়ে

শহরের লোক সবচেয়ে বেশি মেতে ওঠে, ভূতোর সঙ্গে সেইসব নিয়ে আলোচনা করলে দর্শক সবচেয়ে বেশি আনন্দ পায় এটা নবীন বুঝে নিয়েছে। আজকের নকশাটাও বেশ জমে উঠেছিল, এমন সময় দরজায় টোকা পড়ল। নবীন দরজা খুলে বেশ খানিকটা হকচকিয়ে দেখল অক্রূরবাবু দাঁড়িয়ে আছেন।

'আসতে পারি?'

'নিশ্চয়ই।'

নবীন ভদ্রলোককে ঘরে এনে নিজের চেয়ারটা তাঁর দিকে এগিয়ে দিল।

অক্রূরবাবু তৎক্ষণাৎ বসলেন না। তাঁর দৃষ্টি ভূতোর দিকে। সে অনড় ভাবে বসে আছে নবীনের টেবিলের এক কোণে।

অক্রূরবাবু এগিয়ে গিয়ে ভূতোকে তুলে নিয়ে তার মুখটা বেশ মন দিয়ে দেখতে লাগলেন। নবীনের কিছু করার নেই। সে যে খানিকটা অসোয়াস্তি বোধ করছে না সেটা বললে ভুল হবে, তবে অক্রূরবাবুর হাতে অপমান হবার কথাটা সে মোটেই ভোলেনি।

'তোমার হাতের পুতুল বানিয়ে দিলে আমাকে?'

অক্রূরবাবু চেয়ারটায় বসলেন।

'হঠাৎ এ মতি হল কেন?'

নবীন বলল, 'কেন বানিয়েছি সেটা বোধহয় বুঝতে পারছেন। আমি অনেক আশা নিয়ে গিয়েছিলাম আপনার কাছে। সবটুকু ভেঙে দিয়েছিলেন আপনি। তবে এটুকু বলতে পারি—আপনার এই প্রতিমূর্তিই কিন্তু আজ আমাকে প্রতিষ্ঠা এনে দিয়েছে। আমি খেয়ে-পরে আছি এর জন্যেই।'

অক্রূরবাবু এখনও ভূতোর দিক থেকে চোখ সরাননি। বললেন, 'তুমি জানো কি না জানি না—বারাসাতে সেদিন আমার একটা শো ছিল। স্টেজে নেমেই যদি চতুর্দিক থেকে 'ভূতো' 'ভূতো' বলে টিটকিরি শুনতে হয়, সেটা কি খুব সুখকর হয় বলে তুমি মনে করো? তোমার ভাত-কাপড় আমি জোগাতে পারি, কিন্তু তোমার জন্য যে আমার ভাত-কাপড়ের পথ বন্ধ হয়ে যাচ্ছে তার কী হবে? তুমি কি ভেবেছ আমি এটা এত সহজে মেনে নেব?'

সময়টা সন্ধ্যা। লোড শেডিং। টিমটিম করে দুটি মোমবাতি জ্বলছে নবীনের ঘরে। সেই আলোয় নবীন দেখল অক্রূরবাবুর চোখ দুটো স্টেজে যেমন জ্বলজ্বল করে সেই ভাবে জ্বলছে। ছোট্ট মানুষটার বিশাল একটা দোলায়মান ছায়া পড়েছে ঘরের দেয়ালে। টেবিলের উপর ঢুলুঢুলু চোখ নিয়ে বসে আছে ভূতনাথ—অনড়, নির্বাক্।

'তুমি জানো কি না জানি না', বললেন অক্রূরবাবু, 'ভেন্‌ট্রিলোকুইজমেই কিন্তু আমার জাদুর দৌড় শেষ হয়ে যাচ্ছে না। আমি আঠারো বছর বয়স থেকে আটত্রিশ বছর পর্যন্ত আমাদের দেশের একজন অজ্ঞাতনামা অথচ অসাধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন

জাদুকরের শিষ্যত্ব করেছি। কলকাতা শহরে নয়; হিমালয়ের পাদদেশে এক অত্যন্ত দুর্গম স্থানে।'

'সে জাদু আপনি মঞ্চে দেখিয়েছেন কখনও?'

'না। তা দেখাইনি কারণ সে সব স্টেজে দেখানোর জিনিস নয়। রোজগারের পন্থা হিসেবে আমি সে জাদু ব্যবহার করব না এ প্রতিশ্রুতি আমি দিয়েছিলাম আমার গুরুকে। সে কথা আমি রেখেছি।'

'আপনি আমাকে কী বলতে চাইছেন সেটা ঠিক বুঝতে পারলাম না।'

'আমি শুধু সতর্ক করে দিতে এসেছি। তোমার মধ্যে সাধনার পরিচয় পেয়ে আমি খুশিই হয়েছি। ভেন্ট্রিলোকুইজম যেমন তোমাকে আমি শেখাইনি, তেমনি আমাকেও কেউ শেখায়নি। পেশাদারি জাদুকররা তাদের আসল বিদ্যা কাউকে শেখায় না, কোনওদিনই শেখায়নি। ম্যাজিকের রাস্তা জাদুকরদের নিজেদেরই করে নিতে হয়—যেমন তুমি করে নিয়েছ। কিন্তু তোমার পুতুলের আকৃতি নির্বাচনে তুমি যে ধৃষ্টতা দেখিয়েছ, সেটা আমি বরদাস্ত করতে পারছি না। শুধু এইটুকু বলতে এসেছি তোমাকে।'

অক্রূরবাবু চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লেন। তারপর ভূতনাথের দিকে চেয়ে বললেন, 'আমার চুল আর গোঁফ এতদিন কাঁচা ছিল, এই সবে পাকতে শুরু করেছে। তুমি দেখছি সেটা অনুমান করে আগে থেকেই কিছু পাকা চুল লাগিয়ে রেখেছ। .....যাক, আমি তা হলে আসি।'

অক্রূরবাবু চলে গেলেন।

নবীন দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে ভূতনাথের সামনে এসে দাঁড়াল। পাকা চুল। ঠিকই। দু-একটা পাকা চুল ভূতনাথের মাথায় এবং গোঁফে রয়েছে বটে। এটা নবীন এতদিন লক্ষ্য করেনি। সেটাও আশ্চর্য, কারণ ভূতোকে কোলে নিলে সে নবীনের খুবই কাছে এসে পড়ে, আর সব সময় তার দিকে তাকিয়েই কথাবার্তা চলে। সাদা চুলগুলো আগেই চোখে পড়া উচিত ছিল।

যাই হোক, নবীন আর এই নিয়ে ভাববে না। দেখার ভুল সব মানুষেরই হয়। মুখ-চোখের দিকেই বেশি দৃষ্টি দিয়েছে নবীন, চুলটা তেমন ভাল করে দেখেনি।

কিন্তু মন থেকে খটকা গেল না।

ভূতোকে বইবার জন্য নবীন একটা চামড়ার কেস করে নিয়েছিল, সেই কেসে ভরে সে পরদিন হাজির হল চিৎপুরে আদিনাথ পালের কাছে। তার সামনে কেস থেকে ভূতোকে বার করে মেঝেতে রেখে নবীন বললে, 'দেখুন তো, এই পুতুলের মাথায় আর গোঁফে যে সাদা চুল রয়েছে, সে কি আপনারই দেওয়া?'

আদিনাথ পাল ভারী অবাক হয়ে বলল, 'এ আবার কী বলছেন স্যার। পাকা চুলের কথা তো আপনি বলেননি। বললে কাঁচা-পাকা মিশিয়ে দিতে তো কোনও অসুবিধে ছিল না। দু'রকম চুলই তো আছে স্টকে; যে যেমনটি চায়।'

'ভুল করে দু-একটা সাদা চুল মিশে যেতে পারে না কি?'

'ভুল তো মানুষের হয় বটেই। তবে তেমন হলে আপনি পুতুল নেবার সময়ই বলতেন না কি? আমার কী মনে হয় জানেন স্যার, অন্য কেউ এসে এ চুল লাগিয়ে দিয়েছে; আপনি টের পাননি।'

তাই হবে নিশ্চয়ই। নবীনের অজান্তেই ঘটনাটা ঘটেছে।

চেতলায় ফ্রেন্ডস ক্লাবের ফাংশনে একটা মজার ব্যাপার হল।

ভূতোর জনপ্রিয়তার এইটেই প্রমাণ যে ফাংশনের উদ্যোক্তারা তার আইটেমটি রেখেছিলেন সবার শেষে। লোড শেডিং নিয়ে রসালো কথোপকথন চলেছে ভূতো আর নবীনে। নবীন দেখল যে ভূতোর উত্তরে সে যে সব সময় তৈরি কথা ব্যবহার করছে তা নয়। তার কথায় অনেক সময় এমন সব ইংরিজি শব্দ ঢুকে পড়ছে যেগুলো নবীন কখনও ব্যবহার করে না—বড় জোর তার মানেটা জানে। নবীনের পক্ষে এ একেবারে নতুন অভিজ্ঞতা। অবিশ্যি তার জন্য শো-এর কোনও ক্ষতি হয়নি, কারণ কথাগুলো খুব লাগসই ভাবেই ব্যবহার হচ্ছিল, আর লোকেও তারিফ করছিল খুবই। ভাগ্যে তারা জানে না যে নবীনের বিদ্যে হাইয়ার সেকেন্ডারি পর্যন্ত।

কিন্তু এই ইংরিজি কথার অপ্রত্যাশিত ব্যবহারটা নবীনের খুব ভাল লাগেনি। তার সব সময়ই মনে হচ্ছিল অন্য একজন কেউ যেন অলক্ষ্যে তার উপর কর্তৃত্ব করছে। শো-এর পর বাড়ি ফিরে এসে ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিয়ে নবীন টেবিল ল্যাম্পটা জ্বালিয়ে ভূতোকে রাখল বাতির সামনে।

কপালের তিলটা কি ছিল আগে? না। এখন রয়েছে। সেদিন তার ঘরে বসেই নবীন প্রথম লক্ষ্য করেছে অক্রূরবাবুর কপালের তিলটা। খুবই ছোট্ট তিল, প্রায় চোখেই পড়ার মতো নয়। ভূতোর কপালেও এখন দেখা যাচ্ছে তিলটা।

আর সেই সঙ্গে আরও কিছু।

আরও খান দশেক পাকা চুল।

আর চোখের তলায় কালি।

এই কালি আগে ছিল না।

নবীন চেয়ার ছেড়ে উঠে পায়চারি শুরু করে দিল। তার ভারী অস্থির লাগছে। ম্যাজিকের পূজারি সে, কিন্তু এ ম্যাজিক বড়ই অস্বস্তিকর। যে ম্যাজিকে সে বিশ্বাস করে তার সবটাই মানুষের কারসাজি। যেটা অলৌকিক, সেটা নবীনের কাছে ম্যাজিক নয়। সেটা অন্য কিছু। সেটা অশুভ। ভূতোর এই পরিবর্তনের মধ্যে সেই অশুভের ইঙ্গিত রয়েছে।

অথচ একদৃষ্টে চেয়ে থেকেও ভূতোকে পুতুল ছাড়া আর কিছুই মনে হয় না। চোখে সেই ঢুলুঢুলু চাহনি, ঠোঁটের কোণে অল্প হাসি, আর খেলার সময় তার নিজের হাতের কারসাজি ছাড়া যে কোনও পুতুলের মতোই অসাড়, নির্জীব।

অথচ তার চেহারায় অল্প অল্প পরিবর্তন ঘটে চলেছে।

আর নবীন কেন জানি বিশ্বাস করে এই পরিবর্তনগুলো অক্রূর চৌধুরীর মধ্যেও ঘটছে। তারও চুলে পাক ধরেছে, তারও চোখের তলায় কালি পড়েছে।

ভূতোর সঙ্গে মাঝে মাঝে কথা বলে টেকনিকটা ঝালিয়ে নেওয়ার অভ্যাস নবীনের প্রথম থেকেই। যেমন—

'আজ দিনটা বেজায় গুমোট করছে, না রে ভূতো?'

'হুঁ, গেজায় গুঙোট।'

'তবে তোর সুবিধে আছে, ঘাম হয় না।'

'কুতুলের আগার ঘাঙ—হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ!'

আজও প্রায় আপনা থেকেই নবীনের মুখ থেকে প্রশ্নটা বেরিয়ে পড়ল।—

'এসব কী ঘটছে বল তো ভূতো?'

উত্তরটা এল নবীনকে চমকে দিয়ে—

'কর্ঙখল, কর্ঙখল!'

কর্মফল।

নবীনের ঠোঁট দিয়েই উচ্চারণটা হয়েছে, যেমন হয় স্টেজে, কিন্তু উত্তরটা তার জানা ছিল না। এটা তাকে দিয়ে বলানো হয়েছে। কে বলিয়েছে সে সম্বন্ধে নবীনের একটা ধারণা আছে।

সে রাত্রে চাকর শিবুর অনেক অনুরোধ সত্ত্বেও নবীন কিচ্ছু খেল না। এমনিতে রাত্রে ওর ঘুম ভালই হয়, কিন্তু সাবধানের মার নেই, তাই আজ একটা ঘুমের বড়ি খেয়ে নিল। একটা নাগাদ বুঝতে পারল বড়িতে কাজ দেবে। হাত থেকে পত্রিকাটা নামিয়ে রেখে হাত বাড়িয়ে টেবিল ল্যাম্পটা নিভিয়ে দিতেই চোখের পাতা বুজে এল।

ঘুমটা ভেঙে গেল মাঝরাত্তিরে।

ঘরে কে কাশল?

সে নিজে কি? কিন্তু তার তো কাশি হয়নি। অথচ কিছুক্ষণ থেকেই যেন খুক্ খুক্ শব্দ শুনতে পাচ্ছে সে।

ল্যাম্পটা জ্বালাল নবীন।

ভূতনাথ বসে আছে সেই জায়গাতেই, অনড়। তবে তার দেহটা যেন একটু সামনের দিকে ঝোঁকা, আর ডান হাতটা ভাঁজ হয়ে বুকের কাছে চলে এসেছে।

নবীন ঘড়িতে দেখল সাড়ে তিনটে। বাইরে পাহারাওয়ালার লাঠির ঠক্ ঠক্। দূরে কুকুর ডাকছে। একটা প্যাঁচা কর্কশস্বরে ডাকতে ডাকতে উড়ে গেল তার বাড়ির উপর দিয়ে। পাশের বাড়িতে কারুর কাশি হয়েছে নিশ্চয়ই। আর জানালা দিয়ে হাওয়া এসে ভূতোর শরীরটাকে সামনে ঝুঁকিয়ে দিয়েছে। বিংশ শতাব্দীতে কলকাতা শহরের জনবহুল মির্জাপুর স্ট্রিটে তার এহেন অহেতুক ভয় অত্যন্ত বিসদৃশ।

নবীন ল্যাম্পটা নিভিয়ে দিল, এবং আবার অল্পক্ষণের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়ল।

পরদিন ফিন্‌লে রিক্রিয়েশন ক্লাবের বাৎসরিক ফাংশনে নবীন প্রথম ব্যর্থতার আস্বাদ পেল।

প্রকাণ্ড হলে প্রকাণ্ড অনুষ্ঠান। যথারীতি তার আইটেম হল শেষ আইটেম। আধুনিক গান, আবৃত্তি, রবীন্দ্রসংগীত, কত্থক নাচ ও তার পর নবীন মুনসীর ভেন্‌ট্রিলোকুইজ্‌ম। সকালে বাড়ি থেকে বেরোবার আগে নিজের গলার যত্ন নেবার জন্য যা করার সবই করেছে নবীন। গলাটাকে পরিষ্কার রাখা খুবই দরকার, কারণ সূক্ষ্মতম কন্ট্রোল না থাকলে ভেন্‌ট্রিলোকুজ্‌ম হয় না। স্টেজে ঢোকার আগে পর্যন্ত সে দেখেছে তার গলা ঠিক আছে। এমন কী ভূতোকে প্রথম প্রশ্ন করার সময়ও সে দেখেছে গলা দিয়ে পরিষ্কার স্বর বেরোচ্ছে। কিন্তু সর্বনাশ হল ভূতোর উত্তরে।

এ উত্তর দর্শকের কানে পৌঁছাবে না, কারণ সর্দি-কাশিতে বসে গেছে সে গলা। আর এটা শুধু ভূতোর গলা। নিজের গলা সাফ এবং স্পষ্ট।

'লাউডার প্লিজ' বলে আওয়াজ দিল পিছনের দর্শক। সামনের দর্শক অপেক্ষাকৃত ভদ্র, তাই তাঁরা আওয়াজ দিলেন না, কিন্তু নবীন জানে যে তাঁরা ভূতোর একটা কথাও বুঝতে পারছেন না।

আরও পাঁচ মিনিট চেষ্টা করে নবীনকে মাপ চেয়ে স্টেজ থেকে বিদায় নিতে হল। এমন লজ্জাকর অভিজ্ঞতা তার জীবনে এই প্রথম।

সেদিনের পারিশ্রমিকটা নবীন নিজেই প্রত্যাহার করল। এ অবস্থায় টাকা নেওয়া যায় না। এই বিভীষিকাময় পরিস্থিতি নিশ্চয়ই চিরকাল চলতে পারে না। অল্পদিনের মধ্যেই আবার স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসবে এ বিশ্বাস নবীনের আছে।

ভাদ্র মাস। গরম প্রচণ্ড। তার উপরে এই অভিজ্ঞতা। নবীন যখন বাড়ি ফিরল তখন রাত সাড়ে এগারোটা। সে রীতিমত অসুস্থ বোধ করছে। এই প্রথম ভূতোর উপর একটু রাগ অনুভব করছে সে, যদিও সে জানে ভূতো তারই হাতের পুতুল। ভূতোর দোষ মানে তারই দোষ।

সত্যজিৎরায়

টেবিলের উপর ভূতোকে রেখে নবীন দক্ষিণের জানালাটা খুলে দিল। হাওয়া বিশেষ নেই, তবে যেটুকু আসে, কারণ আজ শনিবার, রাত বারোটার আগে পাখা চলবে না।

নবীন মোমবাতিটা জ্বেলে টেবিলে রাখতেই একটা জিনিস দেখে তার হাত পা ঠাণ্ডা হয়ে গেল।

ভূতোর কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম।

শুধু তাই না। ভূতোর গালে চকচকে ভাবটা আর নেই। ভূতো শুকিয়ে গেছে। আর ভূতোর চোখ লাল।

এই অবস্থাতেও নবীন তার পুতুলের দিকে আরও দু'পা এগিয়ে না গিয়ে পারল না। কত বিস্ময়, কত বিভীষিকা তার কপালে আছে সেটা দেখবার জন্য যেন তার জেদ চেপে গেছে।

দু' পা-র বেশি এগোনো সম্ভব হল না নবীনের। একটি জিনিস চোখে পড়ায় তার চলা আপনিই বন্ধ হয়ে গেছে।'

ভূতোর গলাবন্ধ কোটের বুকের কাছটায় একটা মৃদু উত্থান-পতন।

ভূতো শ্বাস নিচ্ছে।

শ্বাসের শব্দ শোনা যাচ্ছে কি?

হ্যাঁ, যাচ্ছে বইকী। ট্র্যাফিক-বিহীন নিস্তব্ধ রাত্রে নবীনের ঘরে এখন একটির বদলে দু'টি মানুষের শ্বাসের শব্দ।

হয়তো চরম আতঙ্ক আর প্রচণ্ড বিস্ময় থেকেই নবীনের গলা দিয়ে একটা অস্ফুট শব্দ বেরিয়ে পড়ল—

'ভূতো!'

আর সেই সঙ্গে এক অশরীরী চিৎকার নবীনকে ছিটকে পিছিয়ে দিল তার তক্তপোষের দিকে—

'ভূতো নয়! আমি অক্রূর চৌধুরী!'

নবীন জানে যে সে নিজে এই কথাগুলো উচ্চারণ করেনি। কণ্ঠস্বর ওই পুতুলের। অক্রূর চৌধুরী কোনও এক আশ্চর্য জাদুবলে ওই পুতুলকে সরব করে তুলেছেন। নবীন চেয়েছিল অক্রূর চৌধুরীকে তার হাতের পুতুল বানাতে। এ জিনিস নবীন চায়নি। এই জ্যান্ত পুতুলের সঙ্গে এক ঘরে থাকা নবীনের পক্ষে অসম্ভব। সে এখনই—

কী যেন একটা হল।

একটা শ্বাসের শব্দ কমে গেল কি?

হ্যাঁ, ঠিক তাই।

ভূতো আর নিশ্বাস নিচ্ছে না। তার কপালে আর ঘাম নেই। তার চোখের লাল ভাবটা আর নেই, চোখের তলায় আর কালি নেই।

নবীন খাট থেকে উঠে গিয়ে ভূতোকে হাতে নিল।

একটা তফাত হয়ে গেছে কেমন করে জানি এই অল্প সময়ের মধ্যেই।

ভূতোর মাথা আর ঘোরানো যাচ্ছে না, ঠোঁট আর নাড়ানো যাচ্ছে না। যন্ত্রপাতিতে জাম ধরে গেছে। আর একটু চাপ দিলে ঘুরবে কি মাথা?

চাপ বাড়াতে গিয়ে ভূতোর মাথাটা আলগা হয়ে টেবিলে খুলে পড়ল।

* * *

পরদিন সকালে সিঁড়িতে নবীনের দেখা হল বাড়িওয়ালা সুরেশ মুৎসুদ্দির সঙ্গে। ভদ্রলোক অভিযোগের সুরে বললেন, 'কই মশাই, আপনি তো আপনার পুতুলের খেলা দেখালেন না একদিনও আমাকে। সেই যে ভেন্টিকলোজিয়াম না কী!'

'পুতুল নয়', বলল নবীন, 'এবার অন্য ম্যাজিক ধরব। আপনার যখন শখ আছে তখন নিশ্চয়ই দেখাব। কিন্তু হঠাৎ এ প্রসঙ্গ কেন?'

'আপনার এক জাতভাই যে মারা গেছে দেখলুম কাগজে। অক্রূর চৌধুরী।'

'তাই বুঝি?'—নবীন এখনও কাগজ দেখে নি। —'কীসে গেলেন?'

'হৃদরোগে', বললেন সুরেশবাবু, 'আজকাল তো শতকরা সত্তর জনই যায় ওই রোগেই।'

নবীন জানে যে খোঁজ নিলে নির্ঘাত জানা যাবে মৃত্যুর টাইম হল গত কাল রাত বারোটা বেজে দশ মিনিট। □

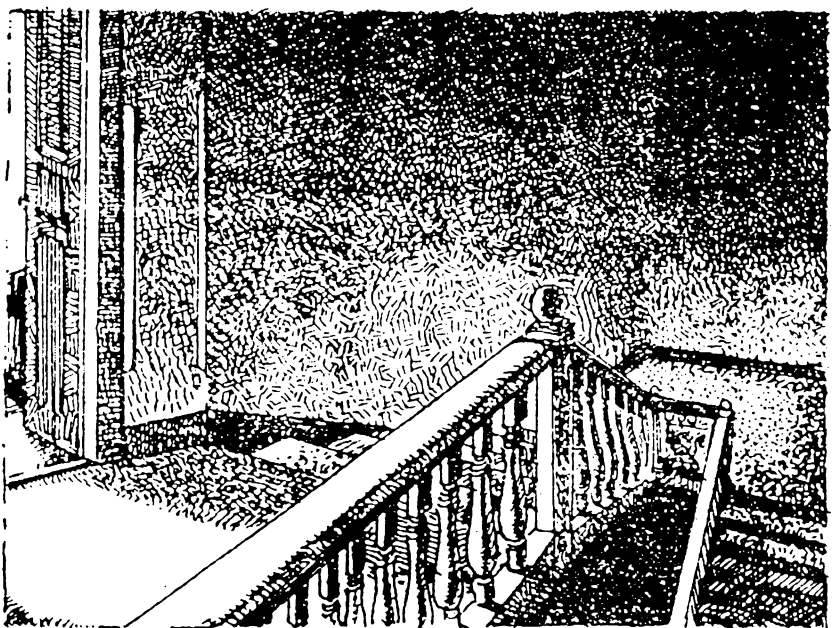

গগন চৌধুরীর স্টুডিও

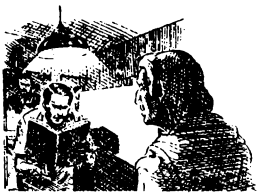

একটা ফ্ল্যাট দিনের বেলা দেখে পছন্দ হলেও, সেখানে গিয়ে থাকা না অবধি তার সুবিধে-অসুবিধেগুলো ঠিক বোঝা যায় না। সুধীন সরকার এইটেই উপলব্ধি করল ভবানীপুরের এই ফ্ল্যাটে বসবাস আরম্ভ করে। এই একটা ব্যাপারেই ভাগ্যলক্ষ্মী একটু শুকনো হাসলেন; না হলে তিনি যে সুধীনের প্রতি সবিশেষ প্রসন্না তার নজিরের অভাব নেই।

যেমন তার পদোন্নতির ব্যাপারটাই ধরা যাক। সে এখন আপিসের একটি ডিপার্টমেন্টের হেড। ঠিক এত তাড়াতাড়ি মাথায় পৌঁছনোর কথা নয়; হাজার হোক তার বয়সটা তো বেশি নয়—এই আষাঢ়ে একত্রিশে পড়েছে সে। ডিপার্টমেন্টের কাঁধ-অবধি এমনিতেই উঠেছিল সুধীন। মাথায় ছিল নগেন্দ্র কাপুর, যাঁর বয়স চল্লিশ, যিনি দীর্ঘাঙ্গা, সুপুরুষ, কর্মক্ষম; যিনি ছাই রঙের সাফারি সুট পরে আপিসে ঢুকলে সকলের দৃষ্টি চলে যায় তাঁর দিকে। সেই নগেন্দ্র কাপুর যে অকস্মাৎ টালিগঞ্জের গল্‌ফের মাঠে হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে শেষ হয়ে যাবেন সে কি কেউ স্বপ্নেও ভেবেছিল? এই মৃত্যুর পরেই সুধীন দেখল প্রায় প্রাকৃতিক নিয়মের মতোই সে কাপুরের জায়গা অধিকার করে বসেছে। এটা অবিশ্যি শুধু কপালজোরে নয়; সুধীন এই পদের উপযুক্ত নয় এ অপবাদ তাকে কেউ দেবে না।

তারপর এই ফ্ল্যাট। সুধীনের বাপ-মা তাকে সংসারী করার জন্য উঠেপড়ে লেগেছেন, সময়টাও ভাল, কাজেই সুধীনকে বাধ্য হয়েই সে অবস্থার জন্য প্রস্তুত হতে হয়েছে। আগে পার্ক সার্কাসে যে ফ্ল্যাটটা ছিল, তার পায়রার খোপের মতো দু'খানা ঘরে সংসার করা চলে না। তা ছাড়া কাছেই ছিল একটা বিয়ে-শাদিতে ভাড়া দেওয়ার বাড়ি। অষ্টপ্রহর গ্রামোফোন রেকর্ডে সানাইয়ের বিকৃত বাঁশফাটা সুরে সুধীনের প্রাণ অতিষ্ঠ হয়ে এসেছিল। দালালের কাছ থেকে খবর পেয়ে সুধীন প্রথম যে ফ্ল্যাটটা দেখতে গেল সেটাই হল ভবানীপুরের এই ফ্ল্যাট। দোতলার ফ্ল্যাট, তিনখানা বেশ বড় বড় ঘর, দুটো বাথরুম, দক্ষিণে বারান্দা, মেঝের মোজেইক, জানলার গ্রিল, ফ্ল্যাটের প্ল্যান—সবকিছুতেই সুপরিকল্পনা ও সুরুচির ছাপ। ভাড়া আটশো। সর্বোপরি বাড়িওয়ালার সঙ্গে কথা বলে তাঁকে মোটামুটি সজ্জন ব্যক্তি হিসেবে মনে হয়। সুধীনের আর দ্বিতীয় কোনও ফ্ল্যাট দেখতে হয়নি।

দু' সপ্তাহ হল সে এসেছে এই ফ্ল্যাটে। প্রথম ক'দিন অত খেয়াল করেনি, তারপর একদিন মাঝরাতে ঘুম ভেঙে দেখল তার চোখে বাইরে থেকে বিজলি আলো এসে পড়েছে। বেশ উজ্জ্বল আলো। এত রাত্রে আলো আসে কোত্থেকে?

সুধীন বিছানা ছেড়ে বাইরে বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াল। সারা পাড়া অন্ধকার, কেবল একটি আলো জ্বলছে রাস্তার উলটো দিকের প্রাচীন অট্টালিকার তিনতলার একটি ঘরে। খোলা জানলার পর্দার উপর দিয়ে সটান এসে বারান্দা পেরিয়ে ঢুকেছে সুধীনের ঘরে। শুধু ঘরে নয়, একেবারে সুধীনের বিছানায়। বালিশ উলটো দিকে ঘুরিয়ে শুলেও সে-আলো পড়বে সুধীনের মুখে।

এ তো বড় জ্বালাতন! ঘর অন্ধকার না হলে মানুষ ঘুমোয় কী করে? অন্তত সুধীন সেটা পারে না। এটা কি রোজই হবে নাকি?

আরও এক সপ্তাহ দেখার পর সুধীন বুঝল এ নিয়মের কোনও ব্যতিক্রম নেই। বারোটার কিছু আগে থেকেই আলোটা জ্বলে, এবং জ্বলে থাকে ভোর অবধি। অথচ নিজের ঘরের দক্ষিণের জানলা বন্ধ করে শোয়ায় সুধীনের ঘোর আপত্তি। কার না হয়? কলকাতায় ওই একটি জিনিসের অনেক দাম। দক্ষিণের জানলা। বিশেষ করে তার সামনে যদি অন্য কোনও বাড়ি না থাকে। সেটাও এ ফ্ল্যাটের একটা লোভনীয় দিক। জানলার সামনে রাস্তার ওপরে হল ওই পুরনো বনেদি বাড়িটার সংলগ্ন বাগান, যেখানে অদূর ভবিষ্যতে নতুন দালান ওঠার কোনও সম্ভাবনা নেই। বাড়িটা কোনও এককালীন জমিদারের সেটা বোঝাই যায়। সংস্কার হয়নি বহুদিন, লোকজনও বিশেষ থাকে বলে মনে হয় না।

এক ওই তিনতলার ঘরে ছাড়া।

কোনও অজ্ঞাত কারণে ওই ঘরের বাসিন্দা সারারাত বাতি জ্বালিয়ে রাখেন। একতলার ফ্ল্যাটে ফ্যামিলি নিয়ে থাকেন সোমেশ্বর নাগ। সুধীনের মাস চারেক আগে ইনি এসেছেন এই ফ্ল্যাটে। বছর পঞ্চান্ন বয়স, বেঙ্গল ক্লাবের মেম্বার, সন্ধ্যাটা তিনি ক্লাবেই কাটান। এক শনিবার বিকেলে বাড়ির গেটে তাঁর সঙ্গে দেখা হওয়ায় সুধীন তাঁর সঙ্গে কিঞ্চিৎ বাক্যালাপের লোভ সামলাতে পারল না।

'আমাদের উলটোদিকের বাড়িটা কাদের বলুন তো?'

'চৌধুরী। কেন, কী ব্যাপার?'

'না, মানে, বাড়িতে তো বিশেষ কেউ থাকে-টাকে বলে মনে হয় না, অথচ তিনতলার একটা ঘরে সারারাত বাতি জ্বলে। সেটা লক্ষ্য করেছেন?'

'না, তা তো করিনি?'

'আপনাদের ঘরে আসে না আলো?'

'সেটা তো সম্ভব নয়। ওদের ছাতের পাঁচিলটা সামনে পড়ে তো। আমরা তো ঘরটাই দেখতে পাই না।'

'খুব বেঁচে গেছেন। আমার তো রাত্রে ঘুমই হয় না ওই আলোর জন্য।'

'ভেরি স্ট্রেঞ্জ! শুনেছি তো ওই এতবড় বাড়িতে একটি কি দুটি মাত্র প্রাণী থাকে। মালিক হলেন গগন চৌধুরী। তাঁকে বড় একটা দেখা-টেখা যায় না। আমি তো এসে অবধি দেখিনি। তবে আছেন বলে জানি। বয়স হয়েছে বোধহয়। শুনেছি এককালে ছবি-টবি আঁকতেন। আপনি এক কাজ করুন না! ভদ্রলোককে গিয়ে সোজাসুজি বলুন। অন্তত ওঁর নিজের ঘরের জানলাটা তো বন্ধ করে দিতে পারেন। এতটুকু কনসিডারেশন হবে না প্রতিবেশীর জন্য?'

এ কাজটা অবিশ্যি করা যায়, যদিও সহজ নয়। অনুরোধ করলেও সেটা যে গ্রাহ্য হবে এমন কোনও গ্যারান্টি নেই। রাত্রে কী ঘটনা ঘটে ওই গগন চৌধুরীর ঘরে?

সুধীন বুঝতে পারল, আলোর জন্য ব্যাঘাতের প্রশ্নটা বড় ঠিকই, কিন্তু ওই প্রাচীন অট্টালিকার ওই ঘরে কী ঘটছে সেটা জানার আগ্রহ কম নয়! তার বন্ধু মহিম রেসের মাঠে যাতায়াত করে; তার একটি বড় বাইনোকুলার আছে। সেটা দিয়ে দেখলে কিছু জানা যাবে কি? বাইনোকুলারের দরকার এইজন্যই যে, ঘরটা নেহাত কাছে নয়, চৌধুরীদের বাড়িটা ঠিক রাস্তার উপরে নয়; পাঁচিল পেরিয়ে সামনে বেশ খানিকটা জায়গা আছে যেটা বাগানেরই অংশ। এই দূরত্বের পরেও আরও দূরত্ব আছে, কারণ তিনতলার ঘরটা ছাতের খানিকটা অংশ পেরিয়ে।

মহিমের বাইনোকুলারে জানলাটা চলে এল অনেকখানি কাছে, কিন্তু পর্দার উপর দিয়ে দেয়ালের খানিকটা অংশ ছাড়া বিশেষ কিছু দেখা গেল না। দেয়ালে টাঙানো তেলরঙে আঁকা দুটি আবক্ষ প্রতিকৃতির খানিকটা করে অংশ দেখা যাচ্ছে সিলিং-এর ওই আলোতে। তা হলে কি শিল্পীর ঘর? এটাই কি ছিল ভদ্রলোকের স্টুডিও? কিন্তু সেখানে কি কোনও মানুষ নেই?

হ্যাঁ, আছে। এইমাত্র জানলার পর্দায় ছায়া ফেলে একটা মূর্তি ডান থেকে বাঁ দিকে চলে গেল। কিন্তু ছায়া থেকে মানুষ চেনা গেল না। পর্দার আলোটা পড়তে তার স্বচ্ছতাও অনেকটা কমে গেছে।

প্রায় পনেরো মিনিট দেখার পর সুধীনের ক্লান্তি এল। যেটুকু ঘুমের সম্ভাবনা তাও কি সে নষ্ট করবে এই ছেলেমানুষি করে?

বাইনোকুলারটা টেবিলের উপর রেখে সুধীন শুয়ে পড়ল। সে মনে মনে স্থির করে নিয়েছে কী করা দরকার।

সোজা গিয়ে গগন চৌধুরীর সঙ্গে দেখা করতে হবে। তাঁকে বলবে তাঁর ঘরের উত্তরের দিকের জানলাটা বন্ধ রাখতে। এতে কাজ হলে হবে, না হলে সুধীনকে এই অবস্থার সঙ্গে মানিয়ে নিতে হবে। গগন চৌধুরী লোকটা কীরকম, সেটা জানা থাকলে ভাল হত—প্রতিবেশীর কাছ থেকে অভদ্র অপমানসূচক ব্যবহার হজম করা খুব কঠিন, তা তিনি যতই প্রবীণ হন না কেন। কিন্তু এক্ষেত্রে ঝুঁকিটা নেওয়া ছাড়া গতি নেই।

গেটটা খোলা এবং দারোয়ান নেই দেখে সুধীনের একটু অবাক লাগল; কিন্তু প্রথম বাধা এত সহজে অতিক্রম করতে পারায় সেইসঙ্গে একটু নিশ্চিন্তও লাগল। সে রাত্রেই যাওয়া স্থির করেছে, কারণ ভদ্রলোক দেখতে চাইলে তাঁকে দেখিয়ে দিতে পারবে আলোটা কীভাবে তার ঘরে পড়ে।

ভবানীপুরের ভদ্রপাড়া শীতকালের রাত এগারোটার মধ্যে নিস্তব্ধ হয়ে গেছে। গতকাল পূর্ণিমা ছিল; চৌধুরীবাড়ির আগাছায় পরিপূর্ণ বাগানের সবকিছুই জ্যোৎস্নার আলোতে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। শ্বেতপাথরের নারীমূর্তি ডাইনে ফেলে সুধীন এগিয়ে গেল নোনা ধরা গাড়ি বারান্দার দিকে। এখনও তিনতলার ঘরে আলো জ্বলেনি। কপাল ভাল হলে গগন চৌধুরীকে হয়তো নীচেই পাওয়া যেতে পারে।

সদর দরজার কড়া নাড়তে কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই একটি ভৃত্যস্থানীয় প্রৌঢ় দরজা খুলে প্রশ্ন করল—'কাকে চাই?'

'চৌধুরীমশাই—গগন চৌধুরী—তিনি কি শুয়ে পড়েছেন?'

'না।'

'তাঁর সঙ্গে একবার দেখা করা যায় কি? আমার নাম সুধীন সরকার। আমি থাকি ওই সামনের বাড়িতে। একটা বিশেষ কাজে এসেছি।'

চাকর ভিতরে গিয়ে আবার মিনিটখানেকের মধ্যেই ফিরে এল।

'আপনি আসুন।'

সব ব্যাপারটাই যে সহজে হয়ে যাচ্ছে—এ তো ভারী আশ্চর্য!

ভিতরে ঢুকে ল্যান্ডিং পেরিয়ে একটা বৈঠকখানায় গিয়ে ঢুকল সুধীন।

'বসুন।'

জানলা দিয়ে একফালি চাঁদের আলো এসে পড়েছে সোফার উপর, তাই সুধীন সেটা দেখতে পেয়ে এগিয়ে গিয়ে বসল। চাকর বাতি জ্বালিয়ে দিয়ে গেল না কেন? এখন তো পাড়ায় লোডশেডিং নেই।

এবারে ঘরের চারদিকে চোখ ঘোরাতে সুধীনের হৃৎস্পন্দন হঠাৎ দেখতে দেখতে দ্বিগুণ হয়ে গেল।

সে কি ঘরভর্তি লোকের মধ্যে এসে পড়ল নাকি? তাকে ঘিরে কারা চেয়ে রয়েছে তার দিকে?

ঘরের প্রায়ান্ধকারে দৃষ্টি আরেকটু অভ্যস্ত হতে সুধীন বুঝতে পারল যারা চেয়ে রয়েছে তারা মানুষ নয়, মুখোশ। প্রত্যেকটি চোখের চাহনি যেন তারই দিকে ঘোরানো। এসব মুখোশ যে এ দেশের নয়, সেটাও বুঝেছে সুধীন। দেখে মনে হয়, অধিকাংশই আফ্রিকার, কিছু দক্ষিণ আমেরিকার হতে পারে। সুধীন এককালে ভাল ছবি আঁকত, বাপের আপত্তি না থাকলে হয়তো সেটাকেই সে পেশা করত। হাতের নানারকম কাজ সম্বন্ধে তার এখনও যথেষ্ট কৌতূহল আছে।

সুধীন মনে মনে নিজের সাহসের তারিফ না করে পারল না। অন্ধকার ঘরে মুখোশ পরিবৃত এই ভৌতিক পরিবেশে অনেকেরই দাঁতকপাটি লেগে যেত।

ঘরে যে কখন লোক প্রবেশ করেছে তা সুধীন টের পায়নি। গম্ভীর কণ্ঠস্বরে প্রশ্ন শুনে চমকে পাশ ফিরে সোফায় বসা মানুষটাকে দেখতে পেল।

'এত রাত্রে?'

সুধীন হাত দুটোকে প্রায় যন্ত্রের মতো সামনে তুলে নমস্কার করে কথা বলতে গিয়েও পারল না।

ইনি যে অভিজাত পরিবারের সন্তান তাতে কোনও সন্দেহ নেই—পরনে দোরোখা শালই তার পরিচয় দিচ্ছে—কিন্তু গায়ের রঙে এমন পাংশুটে রক্তহীন ভাব, আর চোখের চাহনিতে এমন অস্বাভাবিক তীক্ষ্ণতা সুধীন কখনও দেখেনি। এমন ব্যক্তিকে প্রথম দর্শনে কারুরই মুখ দিয়ে চট করে কথা বেরোবে না।

ভদ্রলোক নিষ্পলক দৃষ্টিতে সুধীনের দিকে চেয়ে আছেন। প্রায় এক মিনিট লাগল সুধীনের নিজেকে সামলে নিতে। তারপর সে মুখ খুলল।

'আমি একটা, মানে, অভিযোগ জানাতে এসেছি—কিছু মনে করবেন না। আপনিই গগন চৌধুরী তো?'

ভদ্রলোক একবার শুধু মাথাটা নাড়িয়ে জানিয়ে দিলেন তিনিই সেই ব্যক্তি। প্রশস্ত ললাটের তিনদিক দিয়ে সিংহের কেশরের মতো আধপাকা চুল থেকে মনে হয় বয়স পঁয়ষট্টির কম না।

সুধীন বলে চলল, 'আমার নাম সুধীন্দ্রনাথ সরকার। আমি সামনের বাড়ির দোতলার ফ্ল্যাটে থাকি। আসলে হয়েছে কি, আপনার তিনতলার ঘরের বাতিটা সারারাত জ্বলে বলে বড্ড অসুবিধা হয়। আলোটা সোজা আমার মুখের উপর এসে পড়ে। যদি আপনার জানলাটা বন্ধ করে রাখতে পারতেন! —নইলে ঘুমের বড় ব্যাঘাত হয়। সারাদিন আপিস করে রাত্তিরে ঘুমোতে না পারলে.....'

ভদ্রলোক এখনও একদৃষ্টে চেয়ে আছেন সুধীনের দিকে। এই ঘরের কি কোনও আলোই জ্বলে না নাকি?

অগত্যা সুধীনই আবার মুখ খুলল। ব্যাপারটাকে আরেকটু পরিষ্কার করা দরকার।

'আমি যদি জানলা বন্ধ করি তা হলেও আলো আসবে না ঠিকই, কিন্তু দক্ষিণের জানলা তো, তাই.....'

'আপনার জানলা বন্ধ করতে হবে না।'

'আজ্ঞে?'

'আমিই করব।'

হঠাৎ যেন একটা বিরাট ভার নেমে গেল সুধীনের বুক থেকে।

'ওঃ, তা হলে তো কথাই নেই! অনেক ধন্যবাদ।'

'আপনি উঠছেন?'

সুধীন ওঠার উদ্যোগ করছিল ঠিকই, কিন্তু এই প্রশ্নে একটু অবাক হয়েই আবার বসে পড়ল—'রাত হল তো! আর আপনিও নিশ্চয়ই শুতে যাবেন।'

'আমি রাত্রে ঘুমোই না।'

ভদ্রলোকের দৃষ্টি সুধীনের দিক থেকে একচুল নড়েনি।

'লেখাপড়া করেন বুঝি?' সুধীন ধরা গলায় প্রশ্ন করল। এই পরিবেশে গগন চৌধুরীর সান্নিধ্য যে খুব স্বস্তিকর নয়, সেটা স্বীকার করতেই হবে।

'না।'

'তবে?'

'ছবি আঁকি।'

সুধীনের মনে পড়ে গেল বাইনোকুলার দিয়ে ঘরের দেওয়ালে পেন্টিং দেখে মনে হয়েছিল সেটা চিত্রকরের স্টুডিও হতে পারে। নাগমশাইও বলেছিলেন ইনি এককালে ছবি আঁকতেন।

'তার মানে ওই ঘরটা আপনার স্টুডিও?'

'ঠিকই ধরেছেন।'

'কিন্তু সে-কথা বোধহয় পাড়ার বিশেষ কেউ জানে না?'

গগন চৌধুরী একটা শুকনো হাসি হাসলেন।

'আপনার সময় আছে?'

'সময়, মানে.....'

'তা হলে কতকগুলো কথা বলি। অনেকদিনের জমে থাকা কথা। কাউকে বলার সুযোগ হয়নি কখনও।'

সুধীন অনুভব করল, ভদ্রলোকের অনুরোধ অগ্রাহ্য করার ক্ষমতা তার নেই।

'বলুন।'

'পাড়ার লোকে জানে না, কারণ জানার আগ্রহ নেই। একটা লোক সারাটা জীবন শিল্পচর্চা করে গেল, কিন্তু সে সম্বন্ধে কারুরও কোনও কৌতূহল নেই। এককালে যখন এগজিবিশন করেছি, তখন কেউ কেউ এসে দেখেছে, অল্পবিস্তর সুখ্যাতিও করেছে। কিন্তু যখন হাওয়া বদলাতে শুরু করল, মানুষের যে ছবি রক্তমাংসের মানুষ বলে চেনা যায় তার কদর আর যখন রইল না, তখন থেকে আমি গুটিয়ে নিয়েছি নিজেকে। নতুনের ঝাণ্ডা উড়িয়ে চলতে আমি শিখিনি। মনে মনে দা ভিঞ্চিকে গুরু বলে মেনেছিলাম; এখনও তিনিই আমার গুরু।'

'কিন্তু...আপনি কীসের ছবি আঁকেন?'

'মানুষের।'

'মানুষের?'

'পোর্ট্রেট।'

'মন থেকে?'

'না। সেটা আমি পারি না। শিখিনি। আমার সামনে কেউ এসে না বসলে আমি ছবি আঁকতে পারি না।'

'এই মাঝরাত্তিরে—?'

'আসে। মডেল আসে। সিটিং দেয়। রোজই আসে।'

সুধীন কিছুক্ষণের জন্য হতভম্ব হয়ে বসে রইল। এ কেমনতরো কথাবার্তা বলছেন ভদ্রলোক? এ যে পাগলের প্রলাপের মতো শোনাচ্ছে।

'বিশ্বাস হচ্ছে না!' গগন চৌধুরীর ঠোঁটের কোণে এই প্রথম একটা পরিষ্কার হাসির আভাস দেখা গেল। সুধীন কী বলবে বুঝতে পারল না।

'আসুন আমার সঙ্গে।'

সুধীন এ আদেশও অমান্য করতে পারল না। ভদ্রলোকের চোখে এবং কথায় একটা সম্মোহনী শক্তি আছে, সেটা মানতেই হবে। তার নিজেরও যে কৌতূহল হচ্ছে না তা নয়। কেমন ছবি আঁকেন ভদ্রলোক? কারা আসে সিটিং দিতে মাঝরাত্তিরে? কীভাবে তাদের জোগাড় করা হয়?

'এক আমার স্টুডিওতে ছাড়া বাড়ির আর কোথাও ইলেকট্রিসিটি নেই,' কেরোসিন ল্যাম্পের আবছা হলদে আলোয় কাঠের সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠতে উঠতে বললেন ভদ্রলোক। —'বাকি সব কানেকশন কেটে দিয়েছি।'

আশ্চর্য এই যে, ল্যান্ডিং-এ, সিঁড়ির দেওয়ালে, বৈঠকখানায়—কোথাও একটিও পেন্টিং নেই। সবই কি তা হলে স্টুডিওতে জড়ো করে রেখেছেন ভদ্রলোক?

তিনতলায় উঠে বাঁয়ে ঘুরেই সামনে একটা দরজা। সেই ঘরে সুধীনকে নিয়ে ঢুকে দরজা আবার বন্ধ করে দিয়ে বাঁয়ে দেওয়ালে একটা সুইচ টিপতেই উজ্জ্বল আলোতে ঘরটা ভরে গেল।

এটাই যে স্টুডিও সেটা আর বলে দিতে হয় না। আঁকার সব সরঞ্জামই রয়েছে এখানে। ঘরের এক পাশে আলোর ঠিক নিচে ইজেলে একটা সাদা ক্যানভাস খাটানো রয়েছে। তাতে নতুন ছবি শুরু হবে সেটা বোঝাই যাচ্ছে।

সরঞ্জামের বাইরে যেটা আছে সেটা হল দেওয়ালে টাঙানো এবং মেঝেতে ডাঁই করে রাখা পোর্ট্রেট। কমপক্ষে একশো তো হবেই। মেঝেরগুলো এগিয়ে গিয়ে হাতে তুলে না ধরলে বোঝা যাবে না। যেগুলো চোখের সামনে জলজ্যান্ত সে হল দেওয়ালে টাঙানো পোর্ট্রেটগুলো। অধিকাংশই পুরুষের ছবি। সুধীন তার তৈরি চোখে বুঝে নিল সাবেকি ঢঙে আঁকা পেন্টিংগুলোতে যথেষ্ট মুনশিয়ানার পরিচয় আছে। এখানেও সুধীনের মনে হল যে, সে যেন অনেক জ্যান্ত মানুষের ভিড়ে এসে পড়েছে—এবং সবাই চেয়ে আছে তারই দিকে—কমপক্ষে পঞ্চাশ জোড়া চোখ!

কিন্তু এরা সব কারা? দু-একটা মুখ চেনা-চেনা মনে হচ্ছে বটে, কিন্তু—

'কেমন লাগছে?' প্রশ্ন করলেন গগন চৌধুরী।

'উঁচুদরের কাজ,' স্বীকার করতে বাধ্য হল সুধীন।

'অথচ অয়েল পেন্টিং-এ পোর্ট্রেট আঁকার রেওয়াজটাই লোপ পেয়ে গেছে। সেখানে আমাদের মতো শিল্পীদের কী দশা হয় ভেবে দেখেছেন?'

'কিন্তু এ ঘরে এসে তো মনে হচ্ছে না যে, আপনার কাজের অভাব আছে।'

'কী বলছেন! সে তো এখন! এককালে পনেরো বছর ধরে সামনে কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে গেছি—একটি লোকও সাড়া দেয়নি। শেষটায় বাধ্য হয়ে বন্ধ করে দিই।'

'তারপর? আবার আঁকা শুরু হল কী করে?'

'অবস্থার পরিবর্তনের ফলে।'

সুধীন আর কিছু বলল না, কারণ তার সমস্ত মন এখন ছবির দিকে। ইতিমধ্যে সে তিনজনকে চিনতে পেরেছে। একজন মাস চারেক হল মারা গেছেন। বিখ্যাত গায়ক অনন্তলাল নিয়োগী। সুধীন আসরে বসে তাঁর গান শুনেছে বছর আষ্টেক আগে।

দ্বিতীয়জন হলেন অসীমানন্দ স্বামী—এককালে স্বদেশি করে পরে সন্ন্যাসী হয়ে যান। ইনিও মারা গেছেন বছরখানেক হল। কাগজে ছবি বেরিয়েছিল, সুধীনের মনে আছে।

তৃতীয় ব্যক্তি হলেন এয়ার ইন্ডিয়ার বাঙালি পাইলট ক্যাপ্টেন চক্রবর্তী। লন্ডন যাওয়ার পথে বোয়িং দুর্ঘটনায় আড়াইশো যাত্রী সমেত এঁরও মৃত্যু হয় বছর তিনেক আগে। সুধীন যে শুধু ছবি থেকেই চিনল এঁকে তা নয়; একবার আপিসের কাজে রোম যাওয়ার পথে প্লেনের ককপিটে এঁর সঙ্গে আলাপ হয়েছিল।

সুধীন একটা প্রশ্ন না করে পারল না।

'এঁরা কি শুধুই পোর্ট্রেট করানোর উদ্দেশে এসেছিলেন? সে ছবি নিজেরা নেননি কখনও?'

গগন চৌধুরীকে এই প্রথম গলা ছেড়ে হাসতে শুনল সুধীন।

'না, মিস্টার সরকার, পোর্ট্রেট এঁদের কোনও প্রয়োজন ছিল না। এ শুধু আমার ব্যক্তিগত সংগ্রহের জন্য আঁকা।'

'আপনি কি বলতে চান রোজই কেউ না কেউ এসে আপনাকে সিটিং দেন?'

'সেটা আর একটুক্ষণ থাকলেই দেখতে পাবেন। আজও লোক আসবে।'

সুধীনের মাথা ক্রমেই গুলিয়ে যাচ্ছে।

'কিন্তু এঁদের সঙ্গে যোগাযোগটা কীভাবে—?'

'দাঁড়ান, আপনাকে বুঝিয়ে দিচ্ছি। আমার সিস্টেমটা একটু আলাদা।'

তাক থেকে একটা বেশ বড় খাতা নামিয়ে সুধীনের দিকে নিয়ে এলেন গগন চৌধুরী।

'এটা খুলে দেখুন এতে কী আছে।'

আলোর তলায় নিয়ে গিয়ে খাতাটা খুলল সুধীন।

খাতার পাতার পর পাতায় আঠা দিয়ে সাঁটা রয়েছে খবরের কাগজের পৃষ্ঠা থেকে কাটা মৃত্যুসংবাদ। অনেকগুলো খবরের সঙ্গে ছবিও রয়েছে। সুধীন দেখল যে, কিছু কিছু কাটিং-এর পাশে পেনসিল দিয়ে চিকে দেওয়া রয়েছে।

'পেনসিলের দাগ হলে বুঝতে হবে তাদের ছবি আঁকা হয়ে গেছে,' বললেন গগন চৌধুরী।

'কিন্তু যোগাযোগটা করেন কী করে সেটা তো—'

গগন চৌধুরী সুধীনের হাত থেকে খাতাটা নিয়ে আবার সেটা তাকে রেখে দিলেন। তারপর ঘুরে এগিয়ে বললেন, 'ওটা সকলে পারে না, আমি পারি। এটা চিঠি

বা টেলিফোনের কম্ম নয়। এঁরা যেখানে আছেন সেখানে তো আর টেলিফোন নেই বা ডাক বিলির ব্যবস্থাও নেই। এঁদের জন্য অন্য উপায়ের প্রয়োজন হয়।'

সুধীনের হাত পা ঠাণ্ডা, গলা শুকিয়ে কাঠ। তাও একটা প্রশ্ন না করলেই নয়!

'আপনি কি বলতে চান এইসব লোকের পোর্ট্রেট করা হয়েছে এঁদের মৃত্যুর পর?'

'মৃত্যুর আগে এঁদের খবর পাব কী করে সুধীনবাবু? আমি আর কলকাতার ক'টা লোককে চিনি? মৃত্যু না হলে তো তাঁরা আর তাঁদের গণ্ডির বাইরে বেরোতে পারেন না। একমাত্র মৃত ব্যক্তিই তো সম্পূর্ণ মুক্ত, সম্পূর্ণ স্বাধীন। তাঁদের সময়েরও অভাব নেই, ধৈর্যেরও অভাব নেই। ছবি যতক্ষণ না নিখুঁত হচ্ছে ততক্ষণে ঠায় বসে থাকবেন ওই চেয়ারে।'

ঢং-ঢং-ঢং—

রাত্রের নিস্তব্ধতা বিদীর্ণ করে একটা ঘড়ি বেজে উঠল। সিঁড়ির পাশে যে ঘড়িটা দেখেছিল সুধীন সেটাই বোধহয়।

'বারোটা,' বললেন গগন চৌধুরী। 'এইবার আসবেন।'

'কে?'—সুধীনের গলার স্বর অস্বাভাবিক রকম চাপা ও রুক্ষ। তার মাথা ঝিমঝিম করছে।

'আজকে যিনি বসবেন তিনি। ওই তাঁর পায়ের শব্দ।'

সুধীন শ্রবণশক্তিটা এখনও হারায়নি, তাই সে স্পষ্ট শুনতে পেল বাইরে নীচ থেকে জুতোর শব্দ।

'এসে দেখুন।'—গগন চৌধুরী এগিয়ে গেছেন পাশের একটা জানলার দিকে। 'আমার কথা বিশ্বাস না হয় এসে দেখুন।'

এও কি সেই সম্মোহনী শক্তি? যন্ত্রচালিতের মতো এগিয়ে গিয়ে সুধীন গগন চৌধুরীর পাশে দাঁড়িয়ে নীচের দিকে দৃষ্টি দিল। তারপর তার অজান্তেই একটা আর্তস্বর বেরিয়ে এল তার গলা দিয়ে—

'একে যে চিনি!'

সেই দৃপ্ত মিলিটারি ভঙ্গি, সেই দীর্ঘ গড়ন, সেই ছাই রঙের সাফারি সুট।

ইনিই ছিলেন সুধীনের বস—নগেন্দ্র কাপুর।

সুধীনের মাথা ঘুরছে। টাল সামলানোর জন্য সে ইজেলটাকে জাপটে ধরে ফেলল।

সিঁড়ি দিয়ে পায়ের আওয়াজ উপরে উঠে আসছে। কাঠের সিঁড়িতে জুতোর ক্রমবর্ধমান শব্দে সমস্ত বাড়ি গমগম করছে।

এবার আওয়াজ থামল।

নৈঃশব্দ্যের মধ্যে গগন চৌধুরী মুখ খুললেন আবার।

'যোগস্থাপনের কথা জিজ্ঞেস করছিলেন না, সুধীনবাবু? ভেরি সিম্পল—এইভাবে হাতছানি দিলেই চলে আসে!'

সুধীন বিস্ফারিত চোখে দেখল দোরোখা শালের ভিতর থেকে গগন চৌধুরীর ডান হাতটা বেরিয়ে সামনে প্রসারিত। সে হাতে মাংস, চামড়া কিছুই নেই—খালি হাড়।

'যে হাতে ডাকা, সে হাতেই আঁকা!'

সংজ্ঞা হারাবার আগের মুহূর্তে সুধীন শুনল স্টুডিওর বন্ধ দরজার বাইরে থেকে টোকা পড়ছে—

খট্ খট্ খট্—খট্ খট্ খট্—

খট্ খট্ খট্—খট্ খট্ খট্—

'দাদাবাবু! দাদাবাবু।'

এক ঝটকায় ঘুমটা ভেঙে গিয়ে দিনের আলোয় সুধীনকে আবার তখনই চোখটা কুঁচকে বন্ধ করে নিতে হল। বাপরে—কী ভয়ংকর স্বপ্ন!

'দরজা খুলুন! দাদাবাবু!'

চাকর অধীরের গলা।

'দাঁড়া, এক মিনিট।'

সুধীন বিছানা ছেড়ে এগিয়ে গিয়ে দরজার ছিটকিনি খুলে দিল। অধীরের মুখে গভীর উদ্বেগ।

'আপনি এত বেলী অবধি—'

'জানি। ঘুমটা একটু বেশি হয়ে গেছে।'

'এত হইহল্লা বাড়ির সামনে, কিছুই টের পেলেন না?'

'হইহল্লা?'

'চৌধুরীবাড়ির বড়বাবু যে মারা গেলেন কাল রাত্তিরে। গগনবাবু। চৌরাশি বছর বয়স হয়েছেল। ভুগছিলেন তো অনেকদিন। ঘরে বাতি জ্বালা থাকত রাত্তিরে দেখেননি?'

'তুই জানতিস ওঁর অসুখ?'

'জানব না? ওনার চাকর ভগীরথ—তার সঙ্গো তো দেখা হয় রোজ বাজারে।'

'বোঝো!' □

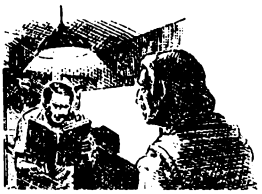

ভূমিকা

আমি ভূত। আজ থেকে ঠিক সাড়ে তিন বছর আগে আমি জ্যান্ত ছিলাম। সেই সময় এই দেওঘরের এই বাড়িতেই আগুনে পুড়ে আমার জ্যান্ত অবস্থার শেষ হয়। এই বাড়ির নাম লিলি ভিলা। আমি এখানে এসেছিলাম আমার এক বন্ধুর সঙ্গে ছুটি কাটাতে। একদিন স্টোভে চা করতে গিয়ে স্টোভ ফেটে আমার কাপড়ে আগুন ধরে যায়! আমার মুখেও আগুন লেগেছিল এইটুকু আমার মনে আছে। তারপর আর কিছু মনে নেই। তারপর থেকে আমি এই বাড়িরই বাসিন্দা হয়ে গেছি। আমার চেহারা এখন কীরকম তা আমি নিজে জানি না, কারণ আয়নায় ভূতের ছায়া পড়ে না। জলেও যে পড়ে না সেটা বাঁড়ুজ্যেদের পুকুরে পরখ করে দেখেছি। খুব যে আহামরি চেহারা নয় সেটা বুঝেছি একটা ঘটনা থেকে। লিলি ভিলায় দু' বছর আগে একটা পরিবার ছুটি কাটাতে এসেছিল। সেই পরিবারের কর্তা একদিন আমার মুখোমুখি পড়ে গিয়ে চোখ কপালে তুলে ভিরমি গিয়েছিলেন। দোষটা আমারই; ভূত দেখা দেবে কি অদৃশ্য থাকবে সেটা ভূতের মর্জির উপরই নির্ভর করে। আমি অদৃশ্য থাকতে চেয়েছিলাম, কিন্তু অন্যমনস্কতার ফলে ভুল করে দেখা দিয়ে ফেলেছিলাম। এই ঘটনার পরে বুঝতে পেরেছিলাম যে, আগুনে পুড়ে শরীর আর মুখের যে অবস্থা হয়েছিল, ভূত হয়েও সেই অবস্থাটাই রয়ে গেছে।

এই ভিরমি দেবার ঘটনার পর থেকেই এ বাড়িতে আর কেউ আসে না, কারণ হানাবাড়ি বলে এটার একটা বদনাম রটে গেছে। আমার পক্ষে এটা লোকসান, কারণ বাড়িতে জ্যান্ত লোকজন থাকলে আমার বেশ ভালই লাগে। না হলে তো সেই একা একা দিন কাটানো। ভূত এ তল্লাটে আরও অনেক আছে, কিন্তু এ বাড়িতে তো নেই, কারণ এখানে আর কেউ কখনও অপঘাতে মরেনি। শহরের অন্য জায়গায় যে ভূত আছে তাদের সকলকে আমার পছন্দ নয়। কয়েকজন তো রীতিমতো মন্দ। যেমন নস্করদা, বা ভীম নস্করের ভূত। ওর মতো কুচক্রী ফন্দিবাজ ভূত দুনিয়ায়

দুটো হয় না। এই দেওঘরে কিছুদিন আগে লক্ষ্মণ ত্রিপাঠী বলে এক পোস্টমাস্টার ছিলেন। লক্ষ্মণের সঙ্গে সাপে-নেউলে সম্পর্ক ছিল স্টেট ব্যাঙ্কের কর্মচারী কান্তিভাই দুবের। এক সন্ধ্যায় লক্ষ্মণ ত্রিপাঠী পোস্টাপিস থেকে বাড়ি ফিরছেন; শা-বাবুদের বাড়ি পেরিয়ে মাঠটার কাছে আসতেই ভীম নস্করের ভূত করল কি, ঝপ করে একটা তেঁতুল গাছ থেকে নেমে ত্রিপাঠী মশাইয়ের ঘাড়টা মটকে দিল। তারপর সে কী হই-হুল্লোড়! —থানা দারোগা কোর্ট কাচারি মামলা মকদ্দমা, সব শেষে ফাঁসি পর্যন্ত। কার ফাঁসি? লক্ষ্মণ ত্রিপাঠীর দুশমন কান্তিভাই দুবের। যে-খুনটা করল ভীম নস্করের ভূত, ঘটনাচক্রে সেই খুনের জন্য দায়ী হল কান্তিভাই দুবে। এই উদোর বোঝা যে বুধোর ঘাড়ে চাপবে সেটা জেনেশুনেই নস্করের ভূত করেছিল কাণ্ডটা। আমি বাধা দিয়ে নস্করদাকে বললাম যে তুমি কাজটা ভাল করোনি। ভূত হয়েছ বলেই যে জ্যান্ত মানুষের অপকার করতে হবে এমন তো কোনও কথা নেই। তুমি তোমার রাজ্যে তোমার ধান্দা নিয়ে থাকো, আর জ্যান্তরা থাকুক তাদের ধান্দা নিয়ে। দুই জগতে ঠোকাঠুকি হলেই যত অনাসৃষ্টি।

আমি নিজে সজ্ঞানে কোনও জ্যান্ত মানুষের অনিষ্ট করতে যাইনি। বিশেষ করে যেদিন থেকে বুঝেছি যে আমার চেহারাটা মানুষের মনে আতঙ্ক জাগায়, সেদিন থেকে আমি একদম সাবধান। লিলি ভিলার পিছনে আম-কাঁঠাল বনের একপাশে একটা পুরনো ভাঙা মালির ঘর আছে, সেইখানেই আমি পড়ে থাকি বেশির ভাগটা সময়। অবিশ্যি লিলি ভিলা এখন অনেকদিন থেকেই খালি; কিন্তু কাছেই চৌধুরী বাড়ি থেকে ছেলেরা এখানে লুকোচুরি খেলতে আসে। আশ্চর্য, এই ছেলেগুলোর একদম ভূতের ভয় নেই। কিংবা হয়তো ভূত আছে জেনেই তারা এখানে আসে। যাই হোক, সেই সময়টা আমাকে একদম অদৃশ্য থাকতে হয়। বড়রাই যদি আমাকে দেখে ভিরমি যায়, তা হলে ছোটদের কী অবস্থা হবে ভাবো তো! না; ওসবের মধ্যে আমি নেই।

তবে এটাও ঠিক যে, ভূতদেরও একা-একা লাগে। আমারই একটা গলতির জন্য লিলি ভিলা এখন হানাবাড়ি। তাই এখানে কেউ এসে থাকতে চায় না; আর আমিও জ্যান্ত মানুষের গলার আওয়াজ, তাদের চলাফেরা কাজকর্ম হাসি-তামাশার শব্দ কিছুই পাই না। তাই মনটা এক-একসময় হু হু করে ওঠে। জ্যান্তরা যদি জানত যে ভূতরা তাদের সান্নিধ্য কত পছন্দ করে, তা হলে কি তারা ভূতকে এত ভয় পেত? কখনওই না।

কিন্তু লিলি ভিলাতেও শেষ পর্যন্ত লোক এসে হাজির হল। একদিন সকালে একটা সাইকেল রিকশার হর্ন শুনে ঘর থেকে গলা বাড়িয়ে দেখি রিকশা থেকে মাল নামছে। ক'জন লোক? দু'জন। একজন বাবু, আর একটি চাকর। তাই সই। বেশি লোকের দরকার নেই আমার। নাই-মামার চেয়ে কানা মামা ভাল।

ভূতরা দূর থেকেই খুব স্পষ্ট দেখতে পায়, তাই বলছি—বাবুটির বয়স বছর পঞ্চাশের কাছাকাছি, বেঁটে, মাথায় টাক, খোঁচা খোঁচা গোঁফ, ঘন ভুরু, আর ভ্রূকুটি করা চোখ। বাড়িতে ঢুকেই চাকরটিকে বাবু বললেন, 'সব দেখেশুনে বুঝে নাও। আধঘণ্টার মধ্যে আমার চা চাই। তারপর আমি কাজে বসব।'

এই কথাগুলো অবিশ্যি আমি মালির ঘর থেকেই শুনতে পেলাম। আমরা যেমন দেখি বেশি, তেমনই শুনিও বেশি। আমাদের চোখ কান দুটোই যেন দূরবিনের মতো কাজ করে।

চাকর আধঘণ্টার মধ্যেই বাবুকে চা বিস্কুট এনে দিল। বাবু তখন বাগানের দিকের ঘরটায় তাঁর বাক্স খুলে জিনিসপত্র বার করে গুছিয়ে রাখছেন। জানালার সামনে একটা টেবিল-চেয়ার। তার উপর দোয়াত কলম কাগজ সব রাখা হয়েছে।

ইনি তা হলে লেখক। খুব নামকরা লেখক কি?

হ্যাঁ, তাই।

ভদ্রলোক আসার ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই দেওঘরের জনা আষ্টেক বাঙালি এসে হাজির হল লিলি ভিলাতে। তখনই জানলাম ভদ্রলোকের নাম নারায়ণ শর্মা। আসল নাম না ছদ্ম তা জানি না, তবে এই নামেই সকলে তাঁকে ডাকে। বাঙালির দল নারায়ণবাবুকে দেওঘরে পেয়ে কৃতার্থ। এতবড় একজন কাউকে তো সবসময় পাওয়া যায় না। তাই, যদি ভদ্রলোকের আপত্তি না থাকে, তা হলে এখানকার সকলে তাঁকে একদিন সংবর্ধনা জানাতে ইচ্ছুক।

নারায়ণ শর্মা লোকটি দেখলাম বেশ কড়া। বললেন, 'এখানে নিরিবিলিতে কাজ করতে পারব বলে কলকাতা ছেড়ে এলাম, আর আসামাত্র আপনারা এসে সংবর্ধনার জন্য পীড়াপীড়ি করছেন?'

এ-কথায় অবিশ্যি সকলেই একটা কাঁচুমাচু ভাব করলেন। তাতে আবার নারায়ণ শর্মা নিজেই নরম হয়ে বললেন, 'বেশ, আমাকে দিন পাঁচেক একটু নির্ঝঞ্ঝাটে কাজ করতে দিন, তারপর হবেখ'ন সংবর্ধনা। বেশি বিব্রত করলে কিন্তু আমি আবার তল্পিতল্পা গুটিয়ে কলকাতা ফিরে যাব।'

এই সময় ঘোষ বাড়ির কর্তা নিতাইবাবু হটাৎ একটা প্রশ্ন করে বসলেন যেটা আমার মোটেই ভাল লাগল না। তিনি বললেন, 'এখানে এত বাড়ি থাকতে আপনি লিলি ভিলায় এসে উঠলেন কেন?'

নারায়ণবাবুর মুখে এই প্রথম হাসির রেখা ফুটে উঠল। তিনি বললেন, 'হানাবাড়ি বলে বলছেন তো? তা, ভূত যদি আসে তা হলে তো ভালই, একজন সঙ্গী পাওয়া যাবে।'

'আপনি বোধহয় আমাদের কথাটা সিরিয়াসলি নিচ্ছেন না,' বললেন হারু তালুকদার। 'কলকাতার এক ডাক্তার এখানে সপরিবারে এসেছিলেন। ভদ্রলোক নিজের চোখে দেখেছিলেন ভূত। আর সে নাকি বীভৎস ব্যাপার। প্রায় পনেরো মিনিট পরে জ্ঞান ফেরে ভদ্রলোকের। এখানে ভাল ডাকবাংলো আছে; ম্যানেজার আপনার খুব ভক্ত। বললে উনি নিজে সব ব্যবস্থা করে দেবেন। আপনি লিলি ভিলা ছাড়ুন।'

এইবার নারায়ণ শর্মা একটা অদ্ভুত কথা বললেন।

'আপনারা বোধহয় জানেন না যে, প্রেততত্ত্ব সম্বন্ধে আমি যতটা জানি ততটা খুব কম লোকেই জানে। আমার এখানকার লেখার বিষয়ও হচ্ছে ওই প্রেততত্ত্ব।

সেই ডাক্তারের অবস্থায় আমাকে কোনওদিন পড়তে হবে না এটা আমি জোর দিয়ে বলতে পারি। তিনি ভূতের বিরুদ্ধে কোনও প্রি-কশন নেননি, কোনও ব্যবস্থা করেননি; আমি সেটা নেব এবং করব। ভূত আমার কিছু করতে পারবে না। আপনারা সদুদ্দেশ্য নিয়েই উপদেশ দিতে এসেছেন তা জানি, কিন্তু আমি এই লিলি ভিলাতে থেকেই কাজ করতে চাই। এ বাড়িতে আমি ছেলে বয়সে এসেছি। তখনকার অনেক স্মৃতি আমার এই বাড়ির সঙ্গে জড়িয়ে আছে।'

ভূতের বিরুদ্ধে ব্যবস্থার কথাটা আমি এই প্রথম শুনলাম। কথাটা ভাল লাগল না। আর প্রেততত্ত্ব? ভূত নিয়েও তত্ত্ব হয় নাকি? এসব কী বলছেন নারায়ণ শর্মা?

অবিশ্যি এখন এসব ভেবে কোনও লাভ নেই। রাতটা আসুক; আপনা থেকেই সব প্রশ্নের উত্তর মিলবে বলে আমার বিশ্বাস।

তবে এই ব্যবস্থার কথাটা শুনে অবধি আমার মন বলছিল যে খবরটা একবার—অন্তত মজা দেখার জন্যও—ভীম নস্করকে জানানো উচিত। সে জ্যান্ত মানুষের ঘাড় মটকাবার কায়দা রপ্ত করেছে; না জানি সে এ খবর শুনে কী বলবে!

বেলা যতই বাড়তে লাগল ততই আমার ছটফটানিও বেড়ে চলল। শেষটায় আর না পেরে অদৃশ্য অবস্থায় মল্লিকদের দুশো বছরের পুরনো পোড়ো বাড়িটায় গিয়ে নস্করদার নাম ধরে ডাক দিলাম। সে দোতলার পুবদিকের ছাত ভাঙা ঘরটা থেকে হাওয়ায় ভেসে নীচে এসে বেশ কড়া সুরেই বলল, 'এই অসময়ে কেন?'

আমি তাকে নারায়ণ শর্মার কথাটা বললাম। শুনে নস্করদা প্রচণ্ড ভ্রূকুটি করে বলল, 'বটে? বলি, ব্যবস্থা কি সে একাই করতে পারে? আমরা পারি না?'

'কী ব্যবস্থা করবে?' ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলাম আমি। আমি বুঝেছিলাম যে নস্করদার মাথায় ফন্দি খেলছে।

নস্করদা বলল, 'কেন? বেঁচে থাকতে বত্রিশ বছর ধরে ব্যায়াম করেছিলুম—ডন বৈঠক মুগুর ডামবেল চেস্ট-এক্সপান্ডার কিছুই বাদ দিইনি। নারায়ণ ছোকরার ঘাড় মটকাবার শক্তি কি আমার নেই?'

ব্যায়াম যে সে করত সেটা ভীম নস্করকে দেখলেই বোঝা যায়। সে বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করেছিল; তাতে তার দেহের কোনও বিকার ঘটেনি; তাই এখনও হাত পা নাড়লে শরীরে মাংসপেশি ঢেউ খেলে যায়। আমি বললাম, 'তা হলে?'

আমি জানি যে আমার হৃৎপিণ্ড থাকলে তা এখন ধুকপুক করত।

'তা হলে আর কিছুই না,' বলল নস্করদা। 'আজ রাত বারোটায় নারায়ণ শর্মার আয়ু শেষ। ভূতের সঙ্গে চালাকি করলে আর যেই করুক, ভূত কখনও ক্ষমা করবে না।'

বাকি দিনটা যে কীভাবে কাটল তা আমিই জানি। এদিকে নারায়ণ শর্মা সারাদিন তাঁর ঘরে বসে লিখেছেন। বিকেলে সূর্য ডোবার বেশ কিছু আগে ভদ্রলোক ঘর থেকে বেরিয়ে উত্তরের রাস্তাটা ধরে বেশ খানিক হেঁটে আকাশে সন্ধেতারাটা বেরোবার কিছুক্ষণের মধ্যে বাড়ি ফিরলেন। আজ অমাবস্যা, তাই চাঁদ নেই।

আমি আমার ডেরা থেকে সবই লক্ষ্য করে যাচ্ছি। এবার নারায়ণ শর্মাকে দেখলাম একটা অদ্ভুত জিনিস করতে। সুটকেস খুলে একটা থলে বার করে তার থেকে একটা গুঁড়ো জিনিসের এক মুঠো নিয়ে একটা ধুনুচির মধ্যে ছড়িয়ে দিয়ে তাতে আগুন দিয়ে ধুনুচিটা ঘরের দরজার চৌকাঠের বাইরে রেখে দিলেন। সেই ধুনুচি থেকে গলগল করে ধোঁয়া উঠতে লাগল, আর দক্ষিণের হাওয়া সেই ধোঁয়াকে সোজা এনে ফেলল আমার ডেরায়।

বাপ্ রে—এ কী ব্যবস্থা! ভূতেরা কোনও গন্ধ পায় না, কিন্তু এ গন্ধ দেখছি নাকের মধ্যে দিয়ে একেবারে ব্রহ্মতালুতে পৌঁছে গেছে। এ কী সর্বনাশ! এ অবস্থায় নস্করদাও এই বাড়ির ত্রিসীমানায় আসতে পারবে না।

আর সত্যিই তাই হল। মাঝরাত্তির নাগাদ আমার ঘরের পিছনের পাঁচিলের ওদিক থেকে চাপা গোঙানি শুনলাম—'সুধন্য! ও সুধন্য!'

সুধন্য আমার নাম।

বাইরে বেরিয়ে দেখি রাস্তার ধারে ঘাসের উপর নাক টিপে বসে আছে ভীম নস্কর। নাকিসুরেই কথা বলল সে—

'একুশ বছর হল গঙ্গাপ্রাপ্তি ঘটেছে আমার, আর এই প্রথম জ্যান্ত লোকের কাছে হার মানতে হল। মানুষ যে এত কল করতে পারে সে তো আমার জানা ছিল না।'

'ও লোকটা পড়াশুনা করে, নস্করদা। ও অনেক কিছু জানে।'

'ও হো হো!—এমন একটা লোকের ঘাড় মটকাতে পারলে কী সুখ হত বল দিকিনি।'

'সে যে আর হবার নয় সে তো বুঝতেই পারছ।'

'তা পারছি। আজ আসি। এ এক নতুন অভিজ্ঞতা হল বটে!'

নস্করদা চলে গেল, আর আমিও নিজের ঘরে ফিরে এলাম। আর তার পরেই বুঝতে পারলাম যে আমার ঘুম পাচ্ছে। ভূতের চোখে ঘুম—এ যে অভাবনীয়,

অবিশ্বাস্য ব্যাপার! কিন্তু তা হলে কী হবে— ওই ধোঁয়াতে এমন জিনিস আছে যে ভূতকেও ঘুম পাড়ায়। অথচ রাতই হল ভূতের চলে বেড়াবার সময়!

আমি আর থাকতে পারলাম না। একটা ঝিমধরা অবস্থায় ঘরের মেঝেতে শুয়ে পড়লাম।

ঘুম ভাঙল একটা গলার শব্দে। সময়টা সকাল।

আমি ধড়ফড়িয়ে উঠে বসলাম। বসেই সামনে তাকিয়ে চক্ষুস্থির। ইনি যে নারায়ণ শর্মা সেটা বুঝতে পারছি, কিন্তু এঁর এমন দশা হল কী করে?

নারায়ণ শর্মাই আমার প্রশ্নের জবাব দিলেন।

'চাকরটা ঘুম থেকে ওঠেনি দেখে স্টোভ জ্বালিয়ে চা করতে গেসলুম। স্টোভটা বার্স্ট করে। ওরা বোধ হয় ওদিকে আমার মৃতদেহের সৎকারের ব্যবস্থা করছে। আমি একটা ডেরা খুঁজছিলুম, তখন এ ঘরটা দেখতে পাই। এখানে আরেকজনের ঠাঁই হবে কি?'

আমি অত্যন্ত খুশি হয়ে বললাম, 'নিশ্চয়ই হবে।'

যাক—দুই মুখ-পোড়ায় জমবে ভাল! □

কাগুজুয়া

মৃগাঙ্কবাবুর সন্দেহটা যে অমূলক নয় সেটা প্রমাণ হল পানাগড়ের কাছাকাছি এসে। গাড়ির পেট্রল ফুরিয়ে গেল। পেট্রলের ইনডিকেটরটা কিছুকাল থেকেই গোলমাল করছে, সে-কথা আজও বেরোবার মুখে ড্রাইভার সুধীরকে বলেছেন, কিন্তু সুধীর গা করেনি। আসলে কাঁটা যা বলছিল তার চেয়ে কম পেট্রল ছিল ট্যাঙ্কে।

'এখন কী হবে?' জিজ্ঞেস করলেন মৃগাঙ্কবাবু।

'আমি পানাগড় চলে যাচ্ছি,' বলল সুধীর, 'সেখান থেকে তেল নিয়ে আসব।'

'পানাগড় এখান থেকে কতদূর?'

'মাইল তিনেক হবে।'

'তার মানে তো দু-আড়াই ঘণ্টা। শুধু তোমার দোষেই এটা হল। এখন আমার অবস্থাটা কী হবে ভেবে দেখেছ?'

মৃগাঙ্কবাবু ঠাণ্ডা মেজাজের মানুষ, ভৃত্যস্থানীয়দের উপর বিশেষ চোটপাট করেন না, কিন্তু আড়াই ঘণ্টা খোলা মাঠের মধ্যে একা গাড়িতে বসে থাকতে হবে জেনে মেজাজটা খিটখটে হয়ে গিয়েছিল।

'তা হলে আর দেরি কোরো না, বেরিয়ে পড়ো। আটটার মধ্যে কলকাতা ফিরতে পারবে তো? এখন সাড়ে তিনটে।'

'তা পারব বাবু।'

'এই নাও টাকা। আর ভবিষ্যতে এমন ভুলটি কোরো না কখনও। লং জার্নিতে এসব রিস্কের মধ্যে যাওয়া কখনওই উচিত নয়।'

সুধীর টাকা নিয়ে চলে গেল পানাগড় অভিমুখে।

মৃগাঙ্কশেখর মুখোপাধ্যায় খ্যাতনামা জনপ্রিয় সাহিত্যিক। দুর্গাপুরে একটি ক্লাবের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে তাঁকে ডাকা হয়েছিল মানপত্র দেওয়া হবে বলে। ট্রেনে রিজার্ভেশন পাওয়া যায়নি, তাই মোটরে যাত্রা। সকালে চা খেয়ে বেরিয়েছেন, আর ফেরার পথে এই দুর্যোগ। মৃগাঙ্কবাবু কুসংস্কারে বিশ্বাস করেন না, পাঁজিতে দিনক্ষণ দেখে যাত্রা করাটা তাঁর মতে কুসংস্কার, কিন্তু আজ পাঁজিতে যাত্রা নিষিদ্ধ বললে তিনি অবাক

হবেন না। আপাতত গাড়ি থেকে নেমে আড় ভেঙে একটা সিগারেট ধরিয়ে তিনি তাঁর চারদিকটা ঘুরে দেখে নিলেন।

মাঘ মাস, খেত থেকে ধান কাটা হয়ে গেছে, চারদিক ধু-ধু করছে মাঠ, দূরে, বেশ দূরে, একটিমাত্র কুঁড়েঘর একটি তেঁতুলগাছের পাশে দাঁড়িয়ে আছে। এ ছাড়া বসতির কোনও চিহ্ন নেই। আরও দূরে রয়েছে একসারি তালগাছ, আর সবকিছুর পিছনে জমাট বাঁধা বন। এই হল রাস্তার এক দিক, অর্থাৎ পুব দিকের দৃশ্য।

পশ্চিমেও বিশেষ পার্থক্য নেই। রাস্তা থেকে চল্লিশ-পঞ্চাশ হাত দূরে একটা পুকুর রয়েছে। তাতে জল বিশেষ নেই। গাছপালা যা আছে তা—দু-একটা বাবলা ছাড়া—সবই দূরে। এদিকেও দুটি কুঁড়েঘর রয়েছে, কিন্তু মানুষের কোনও চিহ্ন নেই। আকাশে উত্তরে মেঘ দেখা গেলেও এদিকে রোদ। মাঠের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে একটা কাগ্‌তাড়ুয়া।

শীতকাল হলেও রোদের তেজ আছে বেশ, তাই মৃগাঙ্কবাবু গাড়িতে ফিরে এলেন। তারপর ব্যাগ থেকে একটা গোয়েন্দা কাহিনী বার করে পড়তে আরম্ভ করলেন।

এর মধ্যে দুটো অ্যাম্বাসাডর আর একটা লরি গেছে তাঁর পাশ দিয়ে, তার মধ্যে একটা কলকাতার দিকে। কিন্তু কেউ তাঁর অবস্থা জিজ্ঞেস করার জন্য থামেনি। মৃগাঙ্কবাবু মনে মনে বললেন, বাঙালিরা এ ব্যাপারে বড় স্বার্থপর হয়। নিজের অসুবিধা করে পরের উপকার করাটা তাদের কুষ্ঠিতে লেখে না। তিনি নিজেও কি এদের মতোই ব্যবহার করতেন? হয়তো তাই। তিনিও তো বাঙালি। লেখক হিসেবে তাঁর খ্যাতি আছে ঠিকই, কিন্তু তাতে তাঁর মজ্জাগত দোষগুলোর কোনও সংস্কার হয়নি।

উত্তরের মেঘটা অপ্রত্যাশিতভাবে দ্রুত এগিয়ে এসে সূর্যটাকে ঢেকে ফেলেছে। সঙ্গে সঙ্গে একটা ঠাণ্ডা হাওয়া। মৃগাঙ্কবাবু ব্যাগ থেকে পুলোভারটা বার করে পরে নিলেন। এদিকে সূর্যও দ্রুত নীচের দিকে নেমে এসেছে। পাঁচটার মধ্যেই অস্ত যাবে। তখন ঠাণ্ডা বাড়বে। কী মুশকিলে ফেলল তাঁকে সুধীর!

মৃগাঙ্কবাবু দেখলেন যে, বইয়ে মন দিতে পারছেন না। তার চেয়ে নতুন গল্পের প্লট ভাবলে কেমন হয়? 'ভারত' পত্রিকা তাঁর কাছে একটা গল্প চেয়েছে, সেটা এখনও লেখা হয়নি। একটা প্লটের খানিকটা মাথায় এসেছে এই পথটুকু আসতেই। মৃগাঙ্কবাবু নোটবুক বার করে কয়েকটা পয়েন্ট লিখে ফেললেন।

নাঃ, গাড়িতে বসে আর ভাল লাগে না।

খাতা বন্ধ করে আবার বাইরে এসে দাঁড়িয়ে আরেকটা সিগারেট ধরালেন মৃগাঙ্কবাবু। তারপর কয়েক পা সামনে এগিয়ে রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে এদিক-ওদিক দেখে তাঁর মনে হল বিশ্বচরাচরে তিনি একা। এমন একা তিনি কোনওদিন অনুভব করেননি।

না, ঠিক একা নয়। একটা নকল মানুষ আছে কিছুদূরে দাঁড়িয়ে।

ওই কাগ্‌তাড়ুয়াটা।

মাঠের মধ্যে এক জায়গায় কী যেন একটা শীতের ফসল রয়েছে একটা খেতে, তারই মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে কাগ্‌তাড়ুয়াটা। একটা খাড়া বাঁশ মাটিতে পোঁতা, তার

সঙ্গো আড়াআড়ি ভাবে একটা বাঁশ ছড়ানো হাতের মতো দু'দিকে বেরিয়ে আছে। এই হাত দুটো গলানো রয়েছে একটা ছেঁড়া জামার দুটো আস্তিনের মধ্যে দিয়ে। খাড়া বাঁশটার মাথায় রয়েছে একটা উপুড় করা মাটির হাঁড়ি। দূর থেকে বোঝা যায় না, কিন্তু মৃগাঙ্কবাবু অনুমান করলেন সেই হাঁড়ির রঙ কালো, আর তার উপর সাদা রং দিয়ে আঁকা রয়েছে ড্যাবা ড্যাবা চোখ মুখ। আশ্চর্য—এই জিনিসটা পাখিরা আসল মানুষ ভেবে ভুল করে, আর তার ভয়ে খেতে এসে উৎপাত করে না। পাখিদের বুদ্ধি কি এতই কম? কুকুর তো এ ভুল করে না। তারা মানুষের গন্ধ পায়। কাক চড়ুই কি তা হলে সে গন্ধ পায় না?

মেঘের মধ্যে একটা ফাটল দিয়ে রোদ এসে পড়ল কাগ্‌তাড়ুয়াটার গায়ে। মৃগাঙ্কবাবু লক্ষ্য করলেন যে, যে জামাটা কাগ্‌তাড়ুয়াটার গায়ে পরানো হয়েছে সেটা একটা ছিটের শার্ট। কার কথা মনে পড়ল ওই ছেঁড়া লাল-কালো ছিটের শার্টটা দেখে? মৃগাঙ্কবাবু অনেক চেষ্টা করেও মনে করতে পারলেন না। তবে কোনও একজনকে তিনি ওরকম একটা শার্ট পরতে দেখেছেন—বেশ কিছুকাল আগে।

আশ্চর্য—ওই একটি নকল প্রাণী ছাড়া আর কোনও প্রাণী নেই। মৃগাঙ্কবাবু আর ওই কাগ্‌তাড়ুয়া। এই সময়টা খেতে কাজ হয় না বলে গ্রামের মাঠেঘাটে লোকজন কমই দেখা যায় ঠিকই, কিন্তু এরকম নির্জনতা মৃগাঙ্কবাবুর অভিজ্ঞতায় এই প্রথম।

মৃগাঙ্কবাবু ঘড়ি দেখলেন। চারটে কুড়ি। সঙ্গো ফ্লাস্কে চা রয়েছে। সেইটের সদ্ব্যবহার করা যেতে পারে।

গাড়িতে ফিরে এসে ফ্লাস্ক খুলে ঢাকনায় চা ঢেলে খেলেন মৃগাঙ্কবাবু। শরীরটা একটু গরম হল।

কালো মেঘের মধ্যে ফাঁক দিয়ে সূর্যটাকে একবার দেখা গেল। কাগ্‌তাড়ুয়াটার গায়ে পড়েছে লালচে রোদ। সূর্য দূরের তালগাছটার মাথার কাছে এসেছে, আর মিনিট পাঁচেকেই অস্ত যাবে।

আরেকটা অ্যাম্বাসাডর মৃগাঙ্কবাবুর গাড়ির পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল। মৃগাঙ্কবাবু আরেকটু চা ঢেলে খেয়ে আবার গাড়ি থেকে নামলেন। সুধীরের আসতে এখনও ঘণ্টাখানেক দেরি। কী করা যায়?

পশ্চিমের আকাশ এখন লাল। সেদিক থেকে মেঘ সরে এসেছে। চ্যাপটা লাল সূর্যটা দেখতে দেখতে দিগন্তের আড়ালে চলে গেল। এবার ঝপ করে অন্ধকার নামবে।

কাগ্‌তাড়ুয়া।

কেন জানি মৃগাঙ্কবাবু অনুভব করছেন প্রতি মুহূর্তেই ওই নকল মানুষটা তাঁকে বেশি করে আকর্ষণ করছে।

সেটার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থাকতে থাকতে মৃগাঙ্কবাবু কতকগুলো জিনিস লক্ষ্য করে একটা হৃৎকম্প অনুভব করলেন।

ওটার চেহারায় সামান্য পরিবর্তন হয়েছে কি?

হাত দুটো কি নীচের দিকে নেমে এসেছে খানিকটা?

দাঁড়ানোর ভঙ্গিটা কি আরেকটু জ্যান্ত মানুষের মতো?

খাড়াই বাঁশটার পাশে কি আরেকটা বাঁশ দেখা যাচ্ছে?

ও দুটো কি বাঁশ, না ঠ্যাঙ?

মাথার হাঁড়িটা একটু ছোট মনে হচ্ছে না?

মৃগাঙ্কবাবু বেশি সিগারেট খান না, কিন্তু এই অবস্থায় তাঁকে আরেকটা ধরাতে হল। তিনি এই তেপান্তরের মাঠে একা দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে চোখে ভুল দেখছেন।

কাগ্‌তাড়ুয়া কখনও জ্যান্ত হয়ে ওঠে?

কখনওই না।

কিন্তু—

মৃগাঙ্কবাবুর দৃষ্টি আবার কাগ্‌তাড়ুয়াটার দিকে গেল।

কোনও সন্দেহ নেই। সেটা জায়গা বদল করেছে।

সেটা ঘুরে দাঁড়িয়ে তাঁর দিকে খানিকটা এগিয়ে এসেছে।

এসেছে না, আসছে।

খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলা, কিন্তু দু'পায়ে চলা। হাঁড়ির বদলে একটা মানুষের মাথা। গায়ে এখনও সেই ছিটের শার্ট; আর তার সঙ্গে মালকোঁচা দিয়ে পরা খাটো ময়লা ধুতি।

'বাবু!'

মৃগাঙ্কবাবুর সমস্ত শরীরের মধ্যে দিয়ে একটা শিহরন খেলে গেল। কাগ্‌তাড়ুয়া মানুষের গলায় ডেকে উঠেছে, এবং এ গলা তাঁর চেনা।

এ হল তাঁদের এককালে চাকর অভিরামের গলা। এইদিকেই তো ছিল অভিরামের দেশ। একবার তাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন মৃগাঙ্কবাবু। অভিরাম বলেছিল সে থাকে মানকড়ের পাশের গাঁয়ে। পানাগড়ের আগের স্টেশনই তো মানকড়।

মৃগাঙ্কবাবু চরম ভয়ে পিছোতে পিছোতে গাড়ির সঙ্গে সেঁটে দাঁড়ালেন। অভিরাম এগিয়ে এসেছে তাঁর দিকে। এখন সে মাত্র দশ গজ দূরে।

'আমায় চিনতে পারছেন বাবু?'

মনে যতটা সাহস আছে সবটুকু একত্র করে মৃগাঙ্কবাবু প্রশ্নটা করলেন।—

'তুমি অভিরাম না?'

'অ্যাদ্দিন পরেও আপনি চিনেছেন বাবু?'

মানুষেরই মতো দেখাচ্ছে অভিরামকে, তাই বোধহয় মৃগাঙ্কবাবু সাহস পেলেন। বললেন, 'তোমাকে চিনেছি তোমার জামা দেখে। এ জামা তো আমিই তোমাকে কিনে দিয়েছিলাম।'

'হ্যাঁ বাবু, আপনিই দিয়েছিলেন। আপনি আমার জন্য অনেক করেছেন, কিন্তু শেষে এমন হল কেন বাবু? আমি তো কোনও দোষ করিনি। আপনারা আমার কথা বিশ্বাস করলেন না কেন?'

মৃগাঙ্কবাবুর মনে পড়ল। তিন বছর আগের ঘটনা। অভিরাম ছিল মৃগাঙ্কবাবুদের বিশ বছরের পুরনো চাকর। শেষে একদিন অভিরামের ভীমরতি ধরে। সে মৃগাঙ্ক-বাবুর বিয়েতে পাওয়া সোনার ঘড়িটা চুরি করে বসে। সুযোগ সুবিধা দুইই ছিল অভিরামের। অভিরাম নিজে অবশ্য অস্বীকার করে। কিন্তু মৃগাঙ্কবাবুর বাবা ওঝা ডাকিয়ে কুলোতে চাল ছুড়ে মেরে প্রমাণ করিয়ে দেন যে, অভিরামই চোর। ফলে অভিরামকে ছাড়িয়ে দেওয়া হয়।

অভিরাম বলল, 'আপনাদের ওখান থেকে চলে আসার পর আমার কী হল জানেন? আর আমি চাকরি করিনি কোথাও, কারণ আমার কঠিন ব্যারাম হয়। উদুরি। টাকা-পয়সা নাই। না ওষুধ, না পথ্যি। সেই ব্যারামই আমার শেষ ব্যারাম। আমার এই জামাটা ছেলে রেখে দেয়। সে নিজে কিছুদিন পরে। তারপর সেটা ছিঁড়ে যায়। তখন সেটা কাগ্‌তাড়ুয়ার পোশাক হয়। আমি হয়ে যাই সেই কাগ্‌তাড়ুয়া। কেন জানেন? আমি জানতাম একদিন না একদিন আপনার সঙ্গে আবার দেখা হবে। আমার প্রাণটা ছটফট করছিল—হ্যাঁ, মৃত লোকেরও প্রাণ থাকে—আমি মরে গিয়ে যা জেনেছি সেটা আপনাকে বলতে চাইছিলাম।'

'সেটা কী অভিরাম?'

'বাড়ি ফিরে গিয়ে আপনার আলমারির নিচে পিছন দিকটায় খোঁজ করবেন। সেইখানেই আপনার ঘড়িটা পড়ে আছে এই তিন বছর ধরে। আপনার নতুন চাকর ভাল করে ঝাড়ু দেয় না তাই সে দেখতে পায়নি। এই ঘড়ি পেলে পরে আপনি জানবেন অভিরাম কোনও দোষ করেনি।'

অভিরামকে আর ভাল করে দেখা যায় না—সন্ধ্যা নেমে এসেছে। মৃগাঙ্কবাবু শুনলেন অভিরাম বলছে, 'এতকাল পরে নিশ্চিত হলাম বাবু। আমি আসি। আমি আসি....'

মৃগাঙ্কবাবুর চোখের সামনে থেকে অভিরাম অদৃশ্য হয়ে গেল।

'তেল এনেছি বাবু।'

সুধীরের গলায় মৃগাঙ্কবাবুর ঘুমটা ভেঙে গেল। গল্পের প্লট ফাঁদতে ফাঁদতে কলম হাতে গাড়ির মধ্যে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন তিনি। ঘুম ভাঙতেই তাঁর দৃষ্টি চলে গেল পশ্চিমের মাঠের দিকে। কাগ্‌তাড়ুয়াটা যেমন ছিল তেমনভাবেই দাঁড়িয়ে আছে।

বাড়িতে এসে আলমারির তলায় খুঁজতেই ঘড়িটা বেরিয়ে পড়ল। মৃগাঙ্কবাবু স্থির করলেন ভবিষ্যতে আর কিছু গেলেও ওঝার সাহায্য আর কখনও নেবেন না। □

অভিরাম

'তোমার নাম কি?'

'অভিরাম সাউ, বাবু।'

'তোমার বাড়ি কোথায়?'

'উলুইপুর গাঁয়ে বাবু। উড়িষ্যা।'

'বাড়িতে আছে কে?'

'আমার দাদা আছে, বউদি আছে, দুই ভাইপো আছে।'

'তোমার বাড়ি যেতে হয় না?'

'কালে-ভদ্রে বাবু। আমি তো সংসার করিনি। ধানজমি আছে কিছু, দাদাই দেখে।'

'তুমি বাড়ি গেলে বদলি দিয়ে যাবে তো?'

'নিশ্চয়ই। তবে সে দরকার আমার হবে না বাবু। হলে, বদলি দিয়ে যাব নিশ্চয়ই।'

'বদলির কথা কেন উঠল সেটা বলছি তোমায়, আমার সন্ধ্যেবেলা একা থাকতে ভয় হয়। আমার ভূতের ভয় আছে। আমি রান্নার লোক যাকে পেয়েছি, সে ঠিকে; সন্ধ্যেবেলা রেঁধে দিয়ে চলে যাবে। তখন আমার কাছে আরেকজন লোক থাকা চাই।'

'সে নিয়ে আপনি চিন্তা করবেন না বাবু, ও হয়ে যাবে। আমার নিজের মনে কোনও ভূতের ভয় নেই।'

'ঠিক আছে, অভিরাম।'

লোকটিকে বেশ ভালই লাগল শঙ্করবাবুর। চল্লিশের কাছাকাছি বয়স, বেশ হাসিখুশি, চালাক-চতুর চেহারা। স্টেট ব্যাঙ্কের কর্মচারী শঙ্করবাবু এই সাতদিন হল বদলি হয়ে পশ্চিমবাংলা আর উড়িষ্যার বর্ডারে এই ছোট শহর কাঞ্চনতলায় এসেছেন। নিজে একা মানুষ। দু'খানা ঘরসমেত একতলা

একটি ছোট বাড়ি পেয়েছেন। তাতে তার চলে যাবে। তবে বাড়ির পরিবেশ নিরিবিলি, তাই একজন চাকর সবসময় থাকা দরকার। শঙ্করবাবু ভূতের ভয়টা একটা খাঁটি ভয়। অনেক বছর ধরে, অনেক চেষ্টা করেও সেটা কাটিয়ে উঠতে পারেননি।

অভিরামকে শঙ্করবাবুর দিনে দিনে বেশি ভাল লাগতে লাগল। এমনি কাজ তো ভাল করেই, খাটতেও পারে। আর সন্ধ্যেবেলা সে সত্যি করে শঙ্করবাবুকে সঙ্গ দেয়।

আরেকটা জিনিস শঙ্করবাবুকে অবাক করে, সেটা হল অভিরামের গল্পের স্টক। সে বলে যে, সব গল্প সে ছেলেবেলায় তার দিদিমার মুখে শুনেছে। উড়িষ্যার

অফুরন্ত রূপকথা আর উপকথা। অভিরাম ভূতের গল্প বলার মন্ত্রণাও শঙ্করবাবুকে দিয়েছে। কিন্তু শঙ্করবাবু তাতে আমল দেননি।

'আমি কিন্তু অনেক ভূতের গল্প জানি বাবু', অভিরাম বলল।

'তা হোক, ও জিনিসটা তুমি বাদ দাও।'

'তা বেশ বাবু, তাই হোক। তবে যদি কোনওদিন মনে হয় ভূতের ভয় কাটিয়ে উঠতে পেরেছেন তো আমায় বলবেন, তখন আমি আপনাকে ভূতের গল্প শোনাব। দেখবেন কেমন মজাদার গল্প।'

'তুমি নিজে ভূত মানো, অভিরাম?'

'আমার আর মানা না মানার কী আছে বাবু। ভূত থাকলে আছে, না থাকলে নেই, ব্যস্ ফুরিয়ে গেল। তবে হ্যাঁ, ভূত মানেই যে খারাপ লোক হবে এটা আমি মানি না। ভাল ভূত হলে ক্ষেতি কী?'

কথা আর বেশি আগালো না।

এই ঘটনার তিন মাস পরে এক বর্ষাকালের সকালে অভিরাম শঙ্করবাবুর কাছে এসে বলল, 'বাবু, দাদার কাছ থেকে চিঠি পেয়েছি। বেশী বর্ষা হবার ফলে আমাদের ফসলের খুব ক্ষেতি হয়েছে। দাদা একা সামলাতে পারছেন না। আমাকে তিন-চারদিনের জন্য যেতে দিতে পারবেন বাবু?'

শঙ্করবাবু এই অবস্থায় না করতে পারলেন না। 'কিন্তু তুমি যে যাবে, লোক দিয়ে যাবে তো?'

'নিশ্চয়ই। খুব ভাল লোক দেব। তবে সে বোধ হয় আমার মতো কথা বলতে পারবে না।'

'তা হোক। সন্ধ্যেবেলাটা আমাকে একটু সঙ্গ দিতে পারলেই হল।'

'তা খুব পারবে। আপনি যতক্ষণ না শুতে যাবেন ততক্ষণ ও আপনার কাছে থাকবে।'

অভিরাম চলে গেল। তিনদিন পরে শঙ্করবাবু এক পোস্টকার্ড পেলেন তার ভৃত্যের কাছ থেকে। খবর ভাল নয়। আরও তিনদিন লাগবে সামাল দিতে,

তারপর অভিরাম ফিরবে। শঙ্করবাবু কী আর করেন। এদিকে বদলি চাকরটিকে তাঁর বিশেষ পছন্দ নয়। মুখটা যেন বড় বেশী গোমড়া। যদিও কাজ করে ভালই।

পরদিন সকালে রেডিওতে খবর শুনে শঙ্করবাবু স্তম্ভিত। তাঁর চাকরের গাঁ এবং তার চারপাশে বেশ অনেকখানি এলাকা জুড়ে প্রচণ্ড ঝড়-বৃষ্টির ফলে হাজার হাজার লোক মারা গেছে, এবং আরও অনেক বেশী লোক গৃহহীন।

শঙ্করবাবু মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন। এ অবস্থায় কী করা উচিত তা তিনি স্থির করতে পারলেন না। চিঠি লিখে লাভ নেই। অভিরামও যে লিখবে এমন কোনও ভরসা নেই।

অভিরামের বদলি নিতাইও এ ব্যাপারে কিছু সাহায্য করতে পারল না। রাত দশটা পর্যন্ত বাবুকে সঙ্গ দিয়ে নিতাই উঠে পড়ল।

শঙ্করবাবু একা তাঁর শোয়ার ঘরে প্রবেশ করলেন। বিছানায় শুয়ে বুঝলেন যে, তাঁর ঘুম আসার সম্ভাবনা কম। অভিরামের অভাব তিনি তীব্রভাবে অনুভব করছেন।

ক্রমে রাত নিঝুম হয়ে এল। একটানা ঝিঁঝি ডেকে চলেছে। এবার তার সঙ্গে শেয়ালের ডাক যোগ হল, কেয়া হুয়া, কেয়া হুয়া, কেয়া হুয়া!

হুয়া আবার কেয়া, শঙ্করবাবুর মাথার উপর আকাশ ভেঙে পড়েছে। ভূতের ভয়ে এর মধ্যেই তাঁর শিরদাঁড়া দিয়ে ঢেউ খেলে যাচ্ছে।

ওটা কী?

পায়ের শব্দ না?

শঙ্করবাবু বুঝলেন, তাঁর গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে।

'বাবু।'

সেকী! এ যে অভিরামের গলা!

'অভিরাম নাকি?' চাপা গলায় প্রশ্ন করলেন শঙ্করবাবু।

'হাঁ বাবু! আমি এসেছি, ফিরে এসেছি!'

'আমার ধড়ে প্রাণ এল অভিরাম, দাঁড়া, দরজা খুলি।'

'না বাবু, খুলবেননি।'

'মানে?'

'খুলে কিছু দেখতে পাবেননি।'

'সে কী!'

'আমি অভিরাম বাবু, কিন্তু আসল অভিরাম নই। আমি অভিরামের ভূত। আমায় বন্যায় টেনে নিয়ে গেছে, আমি আর বেঁচে নেই।'

কোনও উত্তর নেই শঙ্করবাবুর দিক থেকে।

'কী বাবু? শুনলেন আমার কথা?'

তবু কোনও উত্তর নেই।

'বাবু।' আবার ডাক এল বাইরের অন্ধকার থেকে।

এবার কথা এল বাড়ির ভিতর থেকে।

'তোকে কীভাবে দেখতে পাব?'

'শুধু একটা ব্যাপার হলে পাবেন।'

'কী?'

'আপনিও যদি ভূত হন।'

'তা সে আর তোকে বলছি কী! তুই ভূত হয়েছিস শুনেই তো আমার আত্মারাম খাঁচা ছাড়া হয়ে গেছে। আমার দেহ ওই পড়ে আছে খাটের উপর, দৃষ্টি ঘরের ছাদের উপর, দেহে প্রাণ নেই।'

'তবে চলে আসুন বাবু!'

'এই এলুম বলে! আমাকে গল্প শোনাতে পারবি, ভূতের গল্প? কারণ, এখন আর ভয় নেই। বাকি মরণটা গল্প শুনে কাটিয়ে দেব, কী বলিস?'

'যা বলেছেন বাবু, যা বলেছেন!' □

তারিণী খুড়ো ও

গোয়েন্দার ঝুড়ি

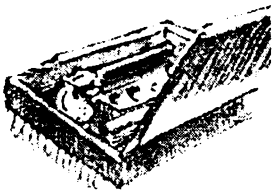

'ডুয়েল মানে জানিস?' জিজ্ঞেস করলেন তারিণীখুড়ো।

'বাঃ, ডুয়েল মানে জানব না?' বলল ন্যাপলা। 'ডুয়েল রোল, মানে দ্বৈত ভূমিকা। সন্তোষ দত্ত গুপী গাইনে ডুয়েল রোল করেছিলেন—হাল্লার রাজা, শুণ্ডীর রাজা।'

'সে ডুয়েলের কথা বলছি না,' হেসে বললেন তারিণীখুড়ো। 'ডি-ইউ-এ-এল নয়, ডি-ইউ-ই-এল ডুয়েল। অর্থাৎ দুজনের মধ্যে লড়াই।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, জানি জানি!' আমরা সকলে একসঙ্গো বলে উঠলাম।

'এই ডুয়েল নিয়ে এককালে কিছু পড়াশুনা করেছিলুম নিজের শখে,' বললেন তারিণীখুড়ো। 'ষোড়শ শতাব্দীর শেষ ভাগে ইটালি থেকে ডুয়েলিং-এর রেয়াজ ক্রমে সারা ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ে। তখন তরোয়াল জিনিসটা ছিল ভদ্রলোকদের পোশাকের একটা অঙ্গা, আর অসি-চালনা বা ফেনসিং শেখাটা পড়ত সাধারণ শিক্ষার মধ্যে। একজন হয়তো আরেকজনকে অপমান করল, অমনি অপমানিত ব্যক্তি ইজ্জত বাঁচাবার খাতিরে অন্যজনকে ডুয়েলে চ্যালেঞ্জ করল; এই চ্যালেঞ্জ অগ্রাহ্য করাটা রেয়াজের মধ্যে পড়ত না, ফলে সোর্ড ফাইট শুরু হয়ে যেত। মান যে বাঁচবেই এমন কোনও কথা নেই, কারণ যিনি চ্যালেঞ্জ করেছেন তিনি অসি চালনায় তেমন নিপুণ নাও হতে পারেন। কিন্তু তাও চ্যালেঞ্জ করা চাই, কারণ অপমান হজম করাটা সেকালে অত্যন্ত হেয় বলে গণ্য হত।

'বন্দুক-পিস্তলের যুগে অবিশ্যি পিস্তলই হয়ে গেল ডুয়েলিং-এর অস্ত্র। সেটা অষ্টাদশ শতাব্দীর ঘটনা। এই ডুয়েলিং-এ তখন এত লোক মরত আর জখম হত, যে এটাকে বেআইনি করার চেষ্টা ইতিহাসে অনেকবার হয়েছে। কিন্তু এক রাজা আইন করে বন্ধ করলেন তো পরের রাজা ঢিলে দেওয়াতে আবার চালু হয়ে গেল ডুয়েলিং। আর কতরকম তার আইনকানুন! —দুজনকেই হুবহু একরকম অস্ত্র ব্যবহার করতে হবে, দুজনেরই একটি করে "সেকেন্ড" বা আম্পায়ার থাকবে যাতে কারচুপির রাস্তা বন্ধ হয়; দুজনকেই দাঁড়াতে হবে এমন জায়গায় যাতে পরস্পরের মধ্যে আন্দাজ বিশ গজের ব্যবধান থাকে, আর চ্যালেঞ্জারের সেকেন্ড "ফায়ার" বলা মাত্র দুজনের একসঙ্গো গুলি চালাতে হবে। তোরা জানিস কিনা জানি না, এই

ভারতবর্ষেই—না, ভারতবর্ষ কেন—এই কলকাতাতেই, আজ থেকে দুশো বছর আগে এক বিখ্যাত ডুয়েল লড়াই হয়েছিল?'

ন্যাপলাও দেখলাম জানে না; সেও আমাদের সঙ্গো মাথা নাড়ল।

'যে দুজন লড়েছিলেন,' বললেন তারিণীখুড়ো, 'তাঁদের একজন তো জগদ্বিখ্যাত। তিনি হলেন ভারতের বড়লাট ওয়ারেন হেস্টিংস। প্রতিপক্ষের নাম ফিলিপ ফ্রানসিস। ইনি ছিলেন বড়লাটের কাউনসিলের সদস্য। হেস্টিংস কোনও কারণে ফ্রানসিসকে একটি অপমানসূচক চিঠি লেখেন। ফ্রানসিস তখন তাকে ডুয়েলে চ্যালেঞ্জ করে। আলিপুরে এখন যেখানে ন্যাশনাল লাইব্রেরি, তারই কাছে একটা খোলা জায়গায় এই ডুয়েল হয়। ফ্রানসিস চ্যালেঞ্জ করেছেন, ফলে তারই এক বন্ধুকে জোড়া-পিস্তল জোগাড় করতে হল, এবং তিনিই "ফায়ার" বলে চেঁচালেন। পিস্তলও চলেছিল একই সঙ্গো, কিন্তু মাটিতে পড়ে জখম হয়ে পড়ল মাত্র একজনই—ফিলিপ ফ্রানসিস। তবে সুখের বিষয় সে-জখম মারাত্মক হয়নি।"

'ইতিহাস তো হল,' বলল ন্যাপলা, 'এবার গল্প হোক্। ডুয়েলিং যখন আপনার মাথায় ঘুরছে, তখন মনে হচ্ছে ডুয়েল নিয়ে নির্ঘাত আপনার কোনও এক্সপিরিয়েন্স আছে।'

খুড়ো বলল, 'তোরা যা ভাবছিস সেরকম অভিজ্ঞতা না থাকলেও, যা আছে শুনলে তাক্ লেগে যাবে।'

দুধ-চিনি ছাড়া চায়ে চুমুক দিয়ে, পকেট থেকে এক্সপোর্ট কোয়ালিটি বিড়ির প্যাকেট আর দেশলাইটা বার করে পাশে তক্তপোষের ওপর রেখে তারিণীখুড়ো তাঁর গল্প শুরু করলেন—

আমি থাকি লখ্নৌতে। রেগুলার চাকরি বলে কিছু নেই, এবং তার বিশেষ প্রয়োজনও নেই, কারণ তার বছর দেড়েক আগে রেঞ্জার্সের লটারিতে লাখ দেড়েক টাকা পেয়ে, তার সুদেই দিব্যি চলে যাচ্ছে। আমি বলছি ফিফ্টি ওয়ানের কথা। তখনও আর এমন মাগ্যির বাজার ছিল না, আমি একা মানুষ, মাসে পাঁচ-সাতশো টাকা হলে দিব্যি আরামে চলে যেত। লাটুশ রোডে একটা ছোট্ট বাংলো বাড়ি নিয়ে থাকি, 'পায়োনিয়ার' কাগজে মাঝে মাঝে ইংরিজিতে চুট্কি গোছের লেখা লিখি, আর হজরতগঞ্জের একটা নিলামের দোকানে যাতায়াত করি। নবাবদের আমলের কিছু কিছু জিনিস তখনও পাওয়া যেত। সুবিধের দামে পেলে ধনী আমেরিকান টুরিস্টদের কাছে বেচে বেশ টুপাইস লাভ করা যেত। অবিশ্যি আমার নিজেরও যে শখ ছিল না তা নয়। আমার বৈঠকখানা ছোট হলেও তার অনেক জিনিসই ছিল এই নিলামের দোকানে কেনা।

এক রবিবার সকালে দোকানে গিয়ে দেখি জিনিসপত্তরের মধ্যে রয়েছে একটা খয়েরি রঙের মেহগনি কাঠের বাক্স, এক হাত লম্বা, এক বিঘত চওড়া, ইঞ্চি তিনেক পুরু। ভেতরে কী থাকতে পারে আন্দাজ করতে পারলাম না, তাই জিনিসটা সম্বন্ধে

কৌতূহল গেল বেড়ে। নিলামে অনেক জিনিসই উঠেছে, কিন্তু আমার মনটা পড়ে রয়েছে ওই বাক্সের দিকে।

অবশেষে প্রায় এক ঘণ্টা অপেক্ষা করার পর দেখলুম নিলামদার বাক্সটাকে হাতে তুলে নিয়েছেন। আমি টান হয়ে বসলুম। যথারীতি গুণকীর্তন শুরু হল। —'এবারে একটি অতি লোভনীয় জিনিস আপনাদের কাছে উপস্থিত করছি। এর জুড়ি পাওয়া ভার। দেখুন, এই যে ঢাকনা খুলছি আমি। দুশো বছরের পুরনো জিনিস, অথচ এখনও এর জেল্লা অম্লান রয়েছে। জগদ্বিখ্যাত আগ্নেয়াস্ত্র প্রস্তুতকারক জোসেফ ম্যানটনের ছাপমারা এক জোড়া ডুয়েলিং পিস্তল! এই জোড়ার আর জুড়ি নেই!...'

আমার তো দূর থেকে দেখেই হয়ে গেছে। ও জিনিসটা আমার চাই। আমার কল্পনা তখনই খেলতে শুরু করে দিয়েছে। চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি দুই প্রতিদ্বন্দ্বী পরস্পরের বিশ হাত দূরে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে 'ফায়ার!' শোনামাত্র গুলি চালাচ্ছে, আর তার পরেই রক্তাক্ত ব্যাপার!

এই সব চিন্তা মাথায় ঘুরছে, নিলামও হয়ে চলেছে, চারবাগের এক গুজরাটি

ভদ্রলোক সাড়ে সাত শো বলার পর আমি ধাঁ করে হাজার বলাতে দেখলাম ডাকাডাকি বন্ধ হয়ে গেল, ফলে বাক্স সমেত পিস্তল দুটি আমারই হয়ে গেল।

জিনিসটা দোকানে দেখে যতটা ভাল লেগেছিল, বাড়িতে এসে হাতে নিয়ে তার চেয়ে যেন শতগুণে বেশি ভাল লাগল। পিস্তলের মতো পিস্তল বটে। যেমন তার বাঁট, তেমনি তার নল। পুরো পিস্তল প্রায় সতেরো ইঞ্চি লম্বা। তার গায়ে পরিষ্কার খোদাই করা রয়েছে মেকারের নাম—জোসেফ ম্যান্টন। বন্দুক সম্বন্ধে কিছু পড়াশুনা আগেই করা ছিল; অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে ইংলন্ডে বন্দুক বানিয়ে হিসেবে যাদের সবচেয়ে বেশি নামডাক ছিল, তার মধ্যে জোসেফ ম্যান্টন হলেন একজন।

লখ্‌নৌ গিয়েছি সবে মাস তিনেক হল। ওখানে বাঙালির সংখ্যা বিশেষ কম নয়, কিন্তু তখনও পর্যন্ত তাদের কারুর সঙ্গে তেমন পরিচয় হয়নি। সন্ধ্যাবেলাটা মোটামুটি বাড়িতেই থাকি; আমি ছাড়া থাকে একজন রান্নার লোক আর একটি চাকর। পিস্তল দুটো কেনা অবধি মাথায় ডুয়েলিং সংক্রান্ত একটা প্লট ঘুরছে, তাই খাতা-কলম নিয়ে আরাম কেদারায় বসেছি, এমন সময় দরজায় কে যেন কড়া নাড়ল। কোনও বিদেশি খদ্দের নাকি? পুরনো জিনিসের সাপ্লায়ার হিসেবে আমার কিছুটা পরিচিতি এর মধ্যেই হয়ে গেছে।

গিয়ে দরজা খুললুম। একজন সাহেবই বটে। বছর পঁয়তাল্লিশ বয়স, বোঝাই যায় এদেশে অনেকদিনের বাসিন্দা, এমন কী জন্মও হয়তো এখানেই। অর্থাৎ অ্যাংলো ইন্ডিয়ান।

'গুড ইভিনিং।'

আমিও প্রত্যাভিবাদন জানালুম। সাহেব বলল, 'একটু দরকার ছিল। ভেতরে বসতে পারি কি?'

'নিশ্চয়ই।'

সাহেবের উচ্চারণে কিন্তু দোআঁশলা ভাব নেই একদম।

ভদ্রলোককে বৈঠকখানায় এনে বসালাম। এইবার আলোয় চেহারাটা আরও স্পষ্ট বোঝা গেল। সুপুরুষই বলা চলে। চুল কটা। একজোড়া বেশ তাগড়াই গোঁফ তাও কটা, চোখের মণি নীল, পরনে ছাই রঙের সুট। আমি বললুম, 'সাহেব, আমি তো মদ খাই না, তবে যদি বলো তো এক পেয়ালা চা বা কফি করে দিতে পারি।' সাহেব বললে যে তার কিছুরই দরকার নেই, সে এইমাত্র বাড়ি থেকে ডিনার খেয়ে আসছে। তারপর তার আসার কারণটা বললে।

'তোমায় আজ সকালে দেখলাম হজরতগঞ্জের অকশন হাউসে।'

'তুমিও ছিলে বুঝি সেখানে?'

'হ্যাঁ—কিন্তু তুমি এত তন্ময় ছিলে তাই বোধহয় খেয়াল করনি।'

'আসলে একটা জিনিসের ওপর খুব লোভ ছিল—'

'সেটা তো তোমারই হয়ে গেল শেষ পর্যন্ত। ডুয়েলিং পিস্তল—জোসেফ ম্যান্টনের তৈরি! ইউ আর ভেরি লাকি!'

আমি একটা কথা না জিজ্ঞেস করে পারলাম না।

'ওটা কি তোমার কোনও চেনা লোকের সম্পত্তি ছিল?'

'হ্যাঁ, তবে সে বহুদিন হল মারা গেছে। তারপর কোথায় চলে গিয়েছিল জিনিসটা জানতাম না। ওটা কি আমি একবার হাতে নিয়ে দেখতে পারি? কারণ ওটার সঙ্গে একটা কাহিনী জড়িত রয়েছে, তাই.....'

আমি সাহেবের হাতে পিস্তলের বাক্সটা দিলুম। সাহেব সেটা খুলে পিস্তলটা বার করে উদ্ভাসিত চোখে সেটা ল্যাম্পের কাছে নিয়ে গিয়ে নেড়ে-চেড়ে দেখে বললে, 'এই পিস্তল দিয়ে এক ডুয়েল লড়া হয়েছিল এই লখ্‌নৌ শহরে সেটা বোধহয় তুমি জান না?'

'লখ্‌নৌতে ডুয়েল!'

'হ্যাঁ। আজ থেকে দেড়শো বছর আগের ঘটনা। একেবারে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষে। সত্যি বলতে কী, আর তিন দিন পরেই ঠিক দেড়শো বছর পূর্ণ হবে। ষোলোই অক্টোবর।'

'তাই বুঝি?'

'হ্যাঁ।'

'খুব আশ্চর্য তো! কিন্তু ডুয়েলটা কাদের মধ্যে হয়েছিল—?'

সাহেব পিস্তলটা ফেরত দিয়ে আবার সোফায় বসে বললে, 'সমস্ত ঘটনাটা আমার এমন পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে শোনা যে আমি যেন চোখের সামনে দেখতে পাই। .....ডাঃ জেরিমায়া হাডসনের মেয়ে অ্যানাবেলা হাডসন তখন ছিল লখ্‌নৌ-এর নামকরা সুন্দরী। ডাকসাইটে তরুণী; ঘোড়া চালায়, বন্দুক চালায়—দুটোই পুরুষের মতো। এদিকে আবার ভাল নাচতে পারে, গাইতে পারে। সেই সময় লখ্‌নৌতে এক তরুণ ইংরেজ আর্টিস্ট এসে রয়েছেন, নাম জন ইলিংওয়ার্থ। তার আসল মতলব নবাবের ছবি এঁকে ভাল ইনাম পাওয়া, কিন্তু অ্যানাবেলার সৌন্দর্যের কথা শুনে আগে তার একটা পোর্ট্রেট করার প্রস্তাব নিয়ে তার বাড়িতে গিয়ে হাজির হল। ছবিও হল বটে, কিন্তু তার আগেই ইলিংওয়ার্থ অ্যানাবেলাকে গভীর ভাবে ভালবেসে ফেলেছে।

'এদিকে তারই কিছুদিন আগে একটা পার্টিতে অ্যানাবেলার সঙ্গে আলাপ হয়েছে চার্লস ব্রুসের। লখ্‌নৌ ক্যান্টনমেন্টে তখন বেঙ্গাল রেজিমেন্টের একটা বড় অংশ ছিল, তারই ক্যাপ্টেন ছিলেন চার্লস ব্রুস। ব্রুসও প্রথম দর্শনেই অ্যানাবেলার প্রেমে পড়ে গেলেন।

'পার্টির দুদিন বাদে আর থাকতে না পেরে অ্যানাবেলার বাড়ি গিয়ে হাজির হলেন ক্যাপ্টেন ব্রুস। গিয়ে দেখেন একটি অচেনা তরুণ অ্যানাবেলার ছবি আঁকছে। ইলিংওয়ার্থ তেমন জোয়ান পুরুষ না হলেও চেহারাটা তার মন্দ ছিল না। তার হাবেভাবে সেও যে অ্যানাবেলার প্রতি অনুরক্ত এটা বুঝতে ব্রুসের দেরি লাগল না। শিল্পী জাতটাকে ব্রুস এমনিতেই অবজ্ঞা করে, বর্তমান ক্ষেত্রে সে অ্যানাবেলার সামনেই ইলিংওয়ার্থকে একটা অপমানসূচক কথা বলে বসল।

'ইলিংওয়ার্থের মধ্যে যা গুণ ছিল তা সবই শিল্পীসুলভ গুণ, আর তার প্রবৃত্তিগুলি ছিল কোমল। কিন্তু আজ অ্যানাবেলার সামনে এই অপমান সে হজম করতে পারল না। সে ব্রুসকে ডুয়েলে চ্যালেঞ্জ করে বসল। ব্রুসও খুশি মনে সে চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করল। ডুয়েলের দিনক্ষণও ঠিক হয়ে গেল—ষোলোই অক্টোবর, ভোর ছটা।'

'তুমি জান বোধহয় যে যারা ডুয়েল লড়বে তাদের একজন করে সেকেন্ডের দরকার হয়?'

আমি বললাম, 'জানি। এরা আম্পায়ারের কাজ করে, অর্থাৎ লক্ষ রাখে যে ডুয়েলের নিয়মগুলো ঠিক ভাবে পালিত হচ্ছে কি না।'

'হ্যাঁ। সচরাচর এই সেকেন্ডটি হয় যে ডুয়েল লড়বে তার বন্ধুস্থানীয় কেউ। লখ্‌নৌ শহরে ইলিংওয়ার্থের পরিচিতের সংখ্যা বেশি না হলেও, সরকারি দপ্তরের এক কর্মচারীর সঙ্গে তার বেশ আলাপ হয়েছিল। এঁর নাম হিউ ড্রামন্ড। ইলিং-ওয়ার্থ ড্রামন্ডকে অনুরোধ করল এক জোড়া ভালো পিস্তল জোগাড় করে দিতে, কারণ ডুয়েলের নিয়ম অনুযায়ী দুটো পিস্তল ঠিক একরকম হওয়া চাই। এ ছাড়া ইলিংওয়ার্থের দ্বিতীয় অনুরোধ হল ড্রামন্ড যেন তার সেকেন্ডের কাজ করে। ড্রামন্ড রাজি হল। অন্যদিকে ক্যাপ্টেন ব্রুসও তার বন্ধু ফিলিপ মক্সনকে তাঁর সেকেন্ড করলেন।

'ডুয়েলের দিন এগিয়ে এল। এর ফলাফল যে কী হবে সে সম্বন্ধে কারুর মনে কোনও সন্দেহ নেই, কারণ পিস্তলে ক্যাপ্টেন ব্রুসের লক্ষ্য অব্যর্থ, আর ইলিং-ওয়ার্থ তুলি চালনায় নিপুণ হলেও পিস্তল চালনায় একেবারেই অপটু।'

এই পর্যন্ত বলে সাহেব থামলেন। আমি ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞেস করলুম, 'শেষ পর্যন্ত কী হল?'

সাহেব মৃদু হেসে বললেন, 'প্রতি বছর ষোলোই অক্টোবর ভোর ছটায় কিন্তু এই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটে।'

'কোথায়?'

'ঘটনাটা যেখানে ঘটেছিল সেখানে। দিলখুশার পশ্চিমে গুমতী নদীর কাছে একটা মাঠে তেঁতুল গাছের নিচে।'

'পুনরাবৃত্তি মানে?'

'যা বলছি তাই। ওখানে তরশু ভোর ছটায় গেলে পুরো ঘটনাই চোখের সামনে ঘটতে দেখবে।'

'বলছ কী! এ তো ভৌতিক ব্যাপার!'

'আমার কথা মানার কোনও বাধ্যবাধকতা নেই। তুমি নিজেই গিয়ে যাচাই করে এসো তিনদিন পরে।'

'কিন্তু আমি কি জায়গাটা ঠিক চিনে যেতে পারব? আমি তো বেশিদিন হল এখানে আসিনি। লখ্‌নৌ-এর ভূগোলটা এখনও—'

'তুমি দিলখুশা চেনো তো?'

'তা চিনি।'

'দিলখুশার বাইরে আমি পৌনে ছটায় তোমার জন্য অপেক্ষা করব।'

'বেশ। তাই কথা রইল।'

সাহেব বিদায় নিয়ে চলে গেলেন। তারপরই খেয়াল হল যে ভদ্রলোকের নামটাই জানা হয়নি। অবিশ্যি উনিও আমার নাম জিজ্ঞেস করেননি। যাই হোক, নামটা বড় কথা নয়; যে কথাগুলো উনি বলে গেলেন সেগুলোই হল আসল। বিশ্বাস হচ্ছিল না যে এই শহরেই এককালে এরকম রোমান্টিক একটা ব্যাপার ঘটে গেছে, এবং আমারই হাতে রয়েছে এক জোড়া পিস্তল যেগুলো এই ঘটনায় একটা বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কার ভাগ্যে জুটল অ্যানাবেলা হাডসন? এবং আরও একটা প্রশ্ন—এই দুজনের মধ্যে কাকে ভালবেসেছিল অ্যানাবেলা?

আশা করি ষোলো তারিখের অভিযানেই এইসব প্রশ্নের জবাব মিলবে।

ক্রমে এগিয়ে এল ষোলোই অক্টোবর। পনেরোই রাত্তিরে একটা গানের জলসা থেকে বাড়ি ফিরছি। রাস্তায় দেখা সেই সাহেবের সঙ্গে। বলল, 'তোমার বাড়িতেই যাচ্ছিলাম তোমাকে মনে করিয়ে দেবার জন্য।' আমি বললাম, 'আমি যে শুধু ভুলিনি তা নয়, অত্যন্ত উদ্‌গ্রীব হয়ে আগামীকাল সকালের জন্য অপেক্ষা করে আছি।' সাহেব চলে গেল।

ঘড়িতে অ্যালার্ম দিয়ে ভোর পাঁচটায় উঠে এক কাপ চা খেয়ে গলায় একটা মাফলার চাপিয়ে নিয়ে একটা টাঙ্গা করে বেরিয়ে পড়লাম দিলখুশার উদ্দেশে। শহরের একটু বাইরে দিলখুশা এককালে ছিল নবাব সাদাত আলির বাগান বাড়ি। চারিদিকে ঘেরা প্রকাণ্ড পার্কে হরিণ চরে বেড়াত। কখনও-সখনও জঙ্গল থেকে এক-আধটা চিতাবাঘও নাকি এসে পড়ত বাড়ির ত্রিসীমানায়। এখন সে বাড়ির শুধু খোলটাই রয়েছে। তবে তার পাশে একটা ফুলবাগিচা এখনও মেনটেন করা হয়, লোকে সেখানে বেড়াতে যায়।

ছটা বাজতে কুড়ি মিনিটে গন্তব্যস্থলে পৌঁছে টাঙ্গাওয়ালাকে বললুম, 'তুমি যদি আধ ঘণ্টা অপেক্ষা কর, তা হলে আমি আবার এই গাড়িতেই বাড়ি ফিরে যেতে পারি।' উর্দুটা ভাল জানা ছিল আগেই, তাই বোধহয় খানদানি আদমি ভেবে টাঙ্গাওয়ালা রাজি হয়ে গেল।

গাড়ি থেকে নেমে কয়েক পা এগোতেই একটা অর্জুন গাছের পাশে দেখি সাহেব দাঁড়িয়ে আছে। বললে সেও নাকি মিনিট পাঁচেক হল এসেছে।

'লেট্‌স গো দেন।'

বললুম, 'চলো সাহেব—তুমিই তো পথ জান, তোমার পিছু নেব আমি।'

মিনিট পাঁচেক হাঁটতেই একটা খোলা মাঠে এসে পড়লুম। দূরে বিশেষ কিছু

দৃষ্টিগোচর হয় না, কারণ চারিদিক একটা আবছা কুয়াশায় ঢাকা। হয়তো ডুয়েলের দিনেও ঠিক এমনি কুয়াশা ছিল।

আগাছা আর কাঁটা ঝোপে ঘেরা একটা পোড়ো বাড়ির কাছে এসে সাহেব থামল। দেখেই বোঝা যায় সেটা প্রাচীনকালে কোনও সাহেবের বাড়ি ছিল। অবিশ্যি আমাদের কারবার এই বাড়িটাকে নিয়ে নয়। সেটাকে পেছনে ফেলে আমরা দাঁড়ালুম পুব দিকে মুখ করে। কুয়াশা হলেও বেশ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে সামনে কিছু দূরে রয়েছে একটা তেঁতুল গাছ, আর তার ডাইনে আমাদের থেকে হাত চল্লিশেক দূরে রয়েছে একটা বেশ বড় ঝোপ। আর সব কিছুর পিছন দিয়ে বয়ে চলেছে গুমতী নদী। নদীর পিছনে কুয়াশা হলেও, আন্দাজ করা যায় ওদিকটায় বসতি নেই। সব মিলিয়ে অত্যন্ত নিরিবিলি পরিবেশ।

'শুনতে পাচ্ছ?' সাহেব হঠাৎ জিজ্ঞেস করল।

কান পাততেই শুনতে পেলুম। ঘোড়ার খুরের শব্দ। গাটা যে ছমছম করছিল না তা বলতে পারি না। তবে তার সঙ্গো একটা অভিনব অভিজ্ঞতার চরম প্রত্যাশা।

এইবার দেখলুম দুই অশ্বারোহীকে। আমাদের বাঁ দিকে বেশ দূর দিয়ে এসে তেঁতুল গাছটার নিচে দাঁড়াল।

'এরা দুজনেই কি লড়বেন?' আমি ফিসফিসিয়ে জিজ্ঞেস করলুম।

সাহেব বলল, 'দুজন নয়, একজন। দুজনের মধ্যে লম্বাটি হলেন জন ইলিং-ওয়ার্থ, অর্থাৎ যিনি চ্যালেঞ্জ করেছেন। অন্যজন ইলিংওয়ার্থের সেকেন্ড ও বন্ধু, হিউ ড্রামন্ড। ওই দেখ ড্রামন্ডের হাতে সেই মেহগ্যানি বাক্স।'

সত্যিই তো! এবার বুঝলুম আমার রক্ত চলাচল দ্রুত হতে শুরু করেছে। আমি যে দেড়শো বছর আগের একটি ঘটনা আজ ১৯৫০ সালে লখ্‌নৌ শহরে দাঁড়িয়ে দেখতে চলেছি, সেই চিন্তা আমার হৃৎস্পন্দন বাড়িয়ে দিয়েছে।

মিনিট খানেকের মধ্যেই দুটো ঘোড়ায় ক্যাপ্টেন ব্রুস ও তাঁর সেকেন্ড ফিলিপ মক্সন এসে পড়লেন। তারপর ড্রামন্ড বাক্স থেকে পিস্তল দুটো বার করে তাতে গুলি ভরে ব্রুস ইলিংওয়ার্থের হাতে দিয়ে তাদের যেন কী সব বুঝিয়ে দিলেন।

পিছনের আকাশ গোলাপি হতে শুরু করেছে, গুমতীর জলে সেই রঙ প্রতিফলিত।

ব্রুস ও ইলিংওয়ার্থ এবার পরস্পরের মুখোমুখি দাঁড়ালেন। তারপর মুখ ঘুরিয়ে দুজনেই গুনে গুনে চোদ্দো পা হেঁটে গিয়ে আবার দাঁড়িয়ে পিছন ফিরে মুখোমুখি হলেন।

এতক্ষণ পর্যন্ত কোনও শব্দ শুনতে পাইনি, কিন্তু এবার দুই প্রতিদ্বন্দ্বী পিস্তল উঁচিয়ে পরস্পরের দিকে তাক করার পর স্পষ্ট কানে এল ড্রামন্ডের আদেশ—

'ফায়ার!'

পরমুহূর্তেই শুনলাম এক সঙ্গো দুই পিস্তলের গর্জন।

আশ্চর্য হয়ে দেখলাম যে ব্রুস ও ইলিংওয়ার্থ দুজনের দেহই একসঙ্গো মাটিতে লুটিয়ে পড়ল।

সেই সঙ্গো আরেকটি দৃশ্য আমাকে আরও অবাক করে দিল। যেই ঝোপটার কথা বলছিলাম, সেটার পিছন থেকে এক মহিলা ছুটে বেরিয়ে কুয়াশায় অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

'ফলাফল তো দেখলে', বলল সাহেব। 'এই ডুয়েলে দুজনেরই মৃত্যু হয়েছিল।'

বললাম, 'তা তো বুঝলাম, কিন্তু ঝোপের পিছন থেকে একজন মহিলা বেরিয়ে চলে গেলেন, তিনি কে?'

'দ্যাট ওয়াজ অ্যানাবেলা।'

'অ্যানাবেলা!'

'ইলিংওয়ার্থের গুলিতে ক্যাপ্টেন ব্রুস মরবে না এটা অ্যানাবেলা বুঝেছিল—

অথচ ওর দরকার ছিল যাতে দুজনেই মরে। তাই সে আর ঝুঁকি না নিয়ে "ফায়ার" বলার সঙ্গো সঙ্গো নিজেই পিস্তল দিয়ে ব্রুসকে মারে। ইলিংওয়ার্থের গুলি ব্রুসের গায়ে লাগেইনি।'

'কিন্তু অ্যানাবেলার এই আচরণের কারণ কী?'

'কারণ সে ওই দুজনের একজনকেও ভালবাসেনি। ও বুঝেছিল ইলিংওয়ার্থ মরবে, এবং ব্রুস বেঁচে থেকে ওকে বিরক্ত করবে। সেটা ও চায়নি, কারণ সে আসলে ভালোবাসত আরেকজনকে—যাকে সে পরে বিয়ে করে এবং যার সঙ্গো সে সুখে ঘর করে।'

আমার চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি, যে দেড়শো বছরের পুরনো ডুয়েলের দৃশ্য দ্রুত মিলিয়ে আসছে। কুয়াশও যেন আরও ঘন হচ্ছে। আমি আশ্চর্য মহিলা অ্যানাবেলার কথা ভাবছি, এমন সময় একটা নারীকণ্ঠ শুনতে পেয়ে চমকে উঠলাম।

'হিউ! হিউই!'

'অ্যানাবেলা ডাকছে,' বললেন সাহেব।

আমার দৃষ্টি এবার সাহেবের দিকে ঘুরতেই শরীরের মধ্যে দিয়ে একটা বিস্ময় ও আতঙ্কের শিহরন খেলে গেল। এ কাকে দেখছি চোখের সামনে? এর পোশাক বদলে গেল কী করে? —এ যে সেই দেড়শো বছর আগের পোষাক।

'তোমাকে আমার পরিচয় দেওয়া হয়নি,' বলল সাহেব; তার গলার স্বর যেন বহুদূর থেকে ভেসে আসছে। —'আমার নাম হিউ ড্রামন্ড। ইলিংওয়ার্থের বন্ধুকেই ভালবাসত অ্যানাবেলা। গুড বাই.....'

আমি মন্ত্রমুগ্ধের মতো দেখলাম সাহেব ওই পোড়ো বাড়িটার দিকে অগ্রসর হয়ে কুয়াশার মধ্যে মিলিয়ে গেল।

টাঙ্গা করে বাড়ি ফিরে মেহগনির বাক্সটা খুলে পিস্তলদুটো আরেকবার বার করলাম। নলে হাত পড়তে গরম লাগল। এবার নলের মুখটা নাকের কাছে আনলাম। টাটকা বারুদের গন্ধ। □

বারো ভূতের গপ্পো-এর খুঁটিনাটি

—ঃ কিছু তথ্য ঃ—

বারো ভূতের গল্পগুলি প্রকাশিত হয়েছিল সন্দেশের বিভিন্ন সংখ্যায় ঃ

অনাথ বাবুর ভয় : সন্দেশ (অগ্রহায়ণ ১৩৬৯)

নীল আতঙ্ক : সন্দেশ (শারদীয়া ১৩৭৫)

ফ্রিৎস : সন্দেশ (পৌষ-মাঘ ১৩৭৭ শীত সংখ্যা)

ব্রাউন সহেবের বাড়ি : সন্দেশ (আষাঢ়-শ্রাবন ১৩৭৮ বর্ষা সংখ্যা)

রতনবাবু আর সেই লোকটা : সন্দেশ (কার্তিক-অগ্রহায়ণ ১৩৭৭ হেমন্ত সংখ্যা) গল্পটি যখন সন্দেশে প্রকাশিত হয় তখন আরোও কিছু লাইন সংযোজিত ছিল। গ্রন্থাকারে প্রকাশের সময় লেখক সেই অংশটি বাদ দিয়ে দেন। উৎসাহী পাঠকের জন্য ঐ অংশটি নীচে দেওয়া হল ঃ

"ঘটনাটা ঘটে চার বছর আগে, কিন্তু আজও লিনির লোকেরা এই রহস্যময় জোড়া-আত্মহত্যার কথা ব'লে বিস্ময় প্রকাশ করে। আর সেখানকার একজনের মনে একটা খট্‌কা রয়ে গেছে। সে হল নিউ মহামায়া হোটেলের চাকর পঞ্চা। পঞ্চা ভাবে—ঐ দুই বাবুকে আমি একসময়ে হাটে দেখলুম—দুজনায় কত কথা হল—এক বাবু আরেকবাবুকে লাঠি কিনে দিলেন—আর পরপর দুদিনে দুজনাই ঠিক একই ভাবে মোলো? ব্যাপারটা যেন কেমন কেমন ঠেকে!"

মিঃ শাসমলের শেষ রাত্রি : সন্দেশ (জ্যৈষ্ঠ ১৩৮৬)

ভূতো : সন্দেশ (আষাঢ় ১৩৮৮)

গগন চৌধুরীর স্টুডিও : সন্দেশ (পৌষ ১৩৯০)। সন্দেশে প্রকাশের সময় গল্পটির অলংকরণ করেছিলেন প্রশান্ত মুখোপাধ্যায়। কিন্তু গ্রন্থাকারে প্রকাশের সময় লেখক নতুন করে ছবি এঁকেছিলেন।

আমি ভূত : সন্দেশ (আষাঢ় ১৩৯২)

কাগ্‌তাড়ুয়া : সন্দেশ (পৌষ ১৩৯৩)

অভিরাম : সন্দেশ (শ্রাবণ ১৩৯৮)। এটি সত্যজিৎ রায়ের শেষ গল্প। সন্দেশে প্রকাশের সময় এই গল্পটির অলংকরণ করেছিলেন শিবশঙ্কর ভট্টাচার্য।

তারিণীখুড়ো ও লখ্‌নৌর ডুয়েল : সন্দেশ (বৈশাখ ১৩৯১)

এই লেখকের অন্যান্য বই

ফেলুদার অভিযান
প্রোফেসর শঙ্কুর অভিযান
তারিণীখুড়োর অভিযান
গোরস্থানে সাবধান
গ্যাংটকে গণ্ডগোল
সাবাস প্রোফেসর শঙ্কু
রয়েল বেঙ্গল রহস্য
ফেলুদা এন্ড কোং
বাক্স-রহস্য
প্রোফেসর শঙ্কু
বাদশাহী আংটি
এক ডজন গপ্‌পো
স্বয়ং প্রোফেসর শঙ্কু
কৈলাসে কেলেঙ্কারি
শঙ্কু একাই ১০০
ফেলুদা ওয়ান ফেলুদা টু
আরো এক ডজন
জয় বাবা ফেলুনাথ
আরো বারো
এবারো বারো
হত্যাপুরী
ছিন্নমস্তার অভিশাপ
ফটিকচাঁদ
যখন ছোট ছিলাম
যত কাণ্ড কাঠমাণ্ডুতে
সেরা সন্দেশ [সম্পাদিত]
বিষয় চলচ্চিত্র [প্রবন্ধ]
একেই বলে শুটিং
কাঞ্চনজঙ্ঘা [চিত্রনাট্য]
নায়ক [চিত্রনাট্য]
ইত্যাদি

মুদ্রকঃ দ্বিজেন্দ্র অফসেট্, ফোনঃ ২৫১২ - ৮৪৪৬